

পাসওয়ার্ড

মাশুদুল হক



রুম থেকে বের হওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি এখনো আমাকে পছন্দ করো?'

'পদ্ম করে, আমি করি না। আমি এতদিনে লিলি হয়ে গেছি!'

আমি হেসে ফেললাম, 'পদ্ম কি ফিরে আসবে না?'

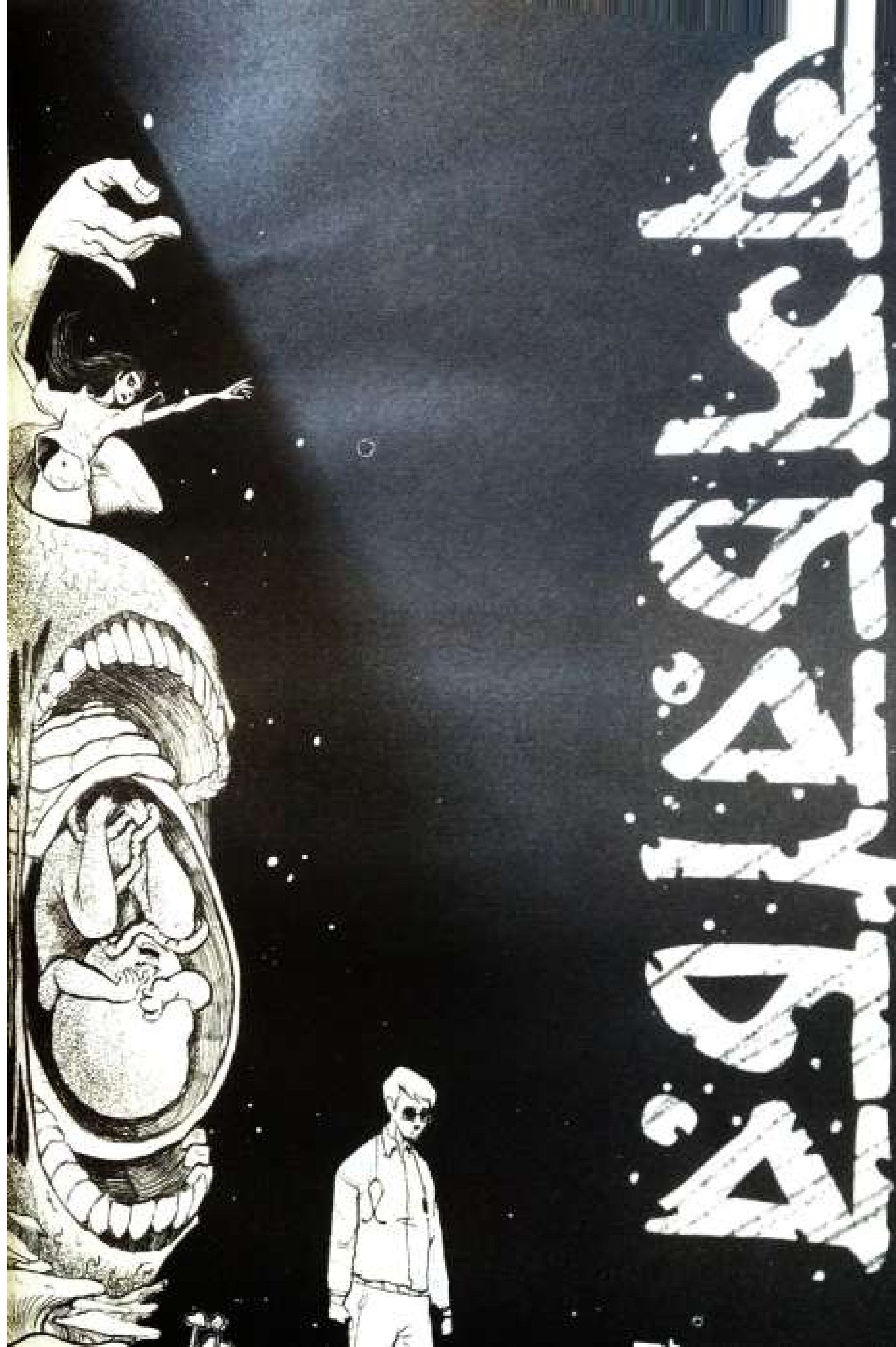
'না, পদ্ম ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। তাই আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনি পদ্মকে ক্ষমা করে দিয়েন। পদ্ম সত্যি আপনাকে ভালবাসতো।'

'লিলিও কি তাহলে আমাকে ভালবাসে না?'

ও একটু থেমে বলল,'লিলি আপনাকে সবসময়ই শ্রদ্ধা করে যাবে, কারণ তার বোন আপনাকে ভালবাসতো।'

প্রচ্ছদ: আদিব রেজা রঙ্গন

অসচরাচর



অসচরাচর

মাশুদুল হক

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

প্রকাশক

এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন

চিরকুট প্রকাশনী

২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

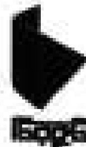
প্রচ্ছদ ও অঙ্কন

আদিব রেজা রঞ্জন

মূল্য

দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

Oschorachor by Mashudul Haque
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 240.00 only



উৎসর্গ

হঠাৎ কিছু গল্প পড়ি, ভীষণ মুগ্ধ হই। লেখককে জানার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয়, খোঁজ নিয়ে বিস্মিত হই। জানতে পারি উনি আমার মেডিকেল কলেজেরই একজন শিক্ষক, যার ক্লাস করে ফরেনসিক মেডিসিনের কত কিছু শিখেছি, কখনো তিনি জানতে দেননি তিনি কি অসাধারণ গল্পকার!

আবদুল হাই মিনার, প্রিয় গল্পকার

পূর্বকথা

মেডিকেলের ফিফথ ইয়ারে পড়ার সময় আমার মাথায় কিছু সমস্যা ধরা পড়ে। প্রথম দিকে ব্যাপারটা এত মাইনর ছিল যে কেউ বুঝতেই পারেনি। সেই সময় আমাদের ওয়ার্ডের ক্লাস নিত মেডিসিনের জাঁদরেল প্রফেসর ইকবাল স্যার। ইকবাল স্যার বছর দুয়েক হয় মারা গেছেন, এত মেধাবী একজন মানুষ মারা গেল সেটা দেশের মানুষ টেরই পেল না। টের পেয়েছে শুধু স্যারের নিয়মিত রোগীরা, তারা এমন ডাক্তার আর পাবে কই!

ইকবাল স্যার গল্পে শোনা ডাক্তারদের মত, যারা দূর থেকেই বলে দিতে পারেন রোগীর কী সমস্যা। স্যারের ক্লাসে এসব কিছু শিখেছিলাম– রোগীর বসা, হাঁটা ইত্যাদি দেখে বলে দেয়া তার সম্ভাব্য কী রোগ; অজ্ঞান রোগীর শোয়ার ধরন দেখেই বলে দেয়া ব্রেনের কোন অংশে সমস্যা হয়েছে ইত্যাদি। ইকবাল স্যারই আমার সমস্যাটা ধরতে পারেন প্রথমে, অথচ আমি তখন সাইকায়াট্রি ওয়ার্ডে নিয়মিত ক্লাস করি, সেখানকার কেউ সন্দেহও করেনি।

স্যার আমাকে ক্লাস শেষে রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আসিফ, আমার ধারণা তোমার কোনো সাইকোলজিক্যাল সমস্যা আছে।' তারপর তিনি কিছু প্রশ্ন করেন, মূলত আমার দৈনন্দিন রুটিন জানতে চান এবং খুঁটিনাটি আরো কিছু ব্যাপার।

সেসব থেকে স্যার ডায়াগনোসিস করেছিলেন আমার সিজোফ্রেনিয়া থাকতে পারে। ইকবাল স্যারের কথা আমি প্রথমে খুব একটা আমলে নেইনি। বরঞ্চ বেশ রাগ হয়েছিল আগ বাড়িয়ে আমার ডায়াগনোসিস করার

জন্য। তবে তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলেই সেটা করেছেন তা নিয়ে নিশ্চিত আমি। স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বরাবরই খুব ভাল থাকায় অনেক বড় বড় স্যারের বিশেষ স্নেহ পেয়েছি।

স্যারের সন্দেহ ক্রমশ সত্যি হয় পরে। ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষার আগ দিয়ে আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন-সারারাত হোস্টেলের বারান্দায় পায়চারি করতাম আর কাল্পনিক নানা কিছুর সাথে কথা বলতাম। আমার বাপ-মা পরে আমাকে বাসায় নিয়ে যায়। একটা হসপিটালে ভর্তি থাকি অনেকদিন।

একটা সময় সুস্থ হই, সময়ের বা ঔষধের গুণে। পড়াশোনা শুরু করি আবার। পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি, পড়াশোনার ব্যাপারটায় খুব একটা ঝামেলা হয়নি, খুব সহজেই পাশ করে যাই পরীক্ষায় বসে। কিন্তু ততদিনে আমি খুব একা হয়ে গেছি। ক্লাসমেটদের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেছে, কেউ খোঁজ রাখতো না। সবাই নিজ নিজ ক্যারিয়ারে ব্যস্ত। পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে আর ইচ্ছা হল না। মনে মনে পরিকল্পনা করলাম, দুই তিন বছর রোগী দেখবো, তারপর না হয় ইচ্ছা হলে আবার পড়াশোনা করবো।

ইকবাল স্যার বলতেন অ্যাটিপিক্যাল কেস পেলে সেই কেসের বিবরণ প্রত্যেক ডাক্তারের লিখে রাখা উচিত, পারলে পাবলিশ করা উচিত জার্নালে। এটা একজন ভাল ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য। কারণ মানুষের রোগ-ব্যাধি খুব রহস্যময়, তারা সবসময় একই ভাবে বইয়ের মত করে আসবে না। তাই ভিন্নধারার কেসগুলো যদি ডাক্তাররা সবাই রিপোর্ট করতো তাহলে রোগ-ব্যাধি বুঝতে, সেটার চিকিৎসা দিতে সুবিধা হবে– এভাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে।

আমি তাই এই অভ্যাসটা করার চেষ্টা করছি। একটু অন্যরকম রোগী পেলেই একটা ডায়েরিতে সেটার বিস্তারিত লিখে রাখি। সেখান থেকেই আজকে আপনাদের কয়েকজন রোগীর গল্প শোনাবো। তবে বলে নেয়া ভাল, এসব রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে অনেক ক্ষেত্রেই আমি নাম-ঠিকানা কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়েছি। আরেকটা কথা হল, কেসগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরীখে ব্যাখ্যা করেছি, চিকিৎসা দিয়েছি কখনো নন-ট্রেডিশনাল মেথডে-যেটা কারো কাছে আন-এথিক্যাল

লাগতে পারে, কখনো এমন কাজও করতে হয়েছে যেগুলো এখন মনে পড়লে বুঝতে পারি অনুচিত কাজ হয়েছে। সেসবের জন্য আগেই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সর্বশেষ কথা হল, আমি এসব রোগী সম্পর্কে বা তাদের রোগ নিয়ে যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছি সেসব পুরোপুরি সঠিক সে দাবি আমি করছি না, মেডিকেল সায়েন্স ক্রমাগত উন্নত হওয়া একটা শাস্ত্র তাই এসব কেসকে রেফারেন্স মেনে কেউ একই ধরনের কেসগুলোকে একই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন না, এই অনুরোধ থাকবে।

সর্বশেষে আমার বন্ধু মাশুদুল হককে ধন্যবাদ, ও আমার কেসগুলো ডায়েরি থেকে নিয়ে পড়তে সুবিধে হয় এমন ভাষায় লিখে দিয়েছে, প্রকাশক জোগাড় করে দিয়েছে। যদিও ও আমাকে অনেকবার বলেছে কাজটা আনন্দ নিয়ে করছে, তারপরও আমি ওর কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ।

ডা. আসিফ আহমেদ



"Illness is the night side of life, a more onerous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship, in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick."

— Susan Sontag, Illness as Metaphor

গল্পক্রম


ঘোস্ট

এটা কয়েক বছর আগের ঘটনা।

মফস্বলের দিকে একটা ঔষধের দোকানের সাথে লাগোয়া চেম্বারে বসা শুরু করেছি। একটু পসার জমাতে সেই এলাকায় একটা বাসা ভাড়া করে থাকা শুরু করলাম, সপ্তাহে প্রতি শুক্র-শনিবার বাড়ি যেতাম বলে বাবা-মা আর আপত্তি করলো না। দিনের বেশির ভাগ সময়ই আমার কাটতো চেম্বারে। জায়গাটার নাম কমলাকান্দি। সিলেট শহর থেকে সিএনজিতে ত্রিশ মিনিট লাগে। আমার ক্লিনিক্যাল সেন্স ভাল হওয়ায় রোগী হত প্রচুর। রোগী দেখতেও আমার বেশ ভাল লাগতো কারণ বাড়ি ফিরে কোনো কাজ ছিল না। কোনো কোনো দিন এমন হচ্ছিলো যে রাত বারটার সময় চেম্বার বন্ধ করছি। ফার্মেসির মালিক মুবিনুল হক চাচা দোকানের চাবি আমার কাছে দিয়ে রাত দশটাতেই বাড়ি চলে যেত। আমি লক্ষ করেছি এই শেষ রাতে কিছু বিচিত্র রোগী আসে। একগ্রুপ হল ইমার্জেন্সি রোগী, হাত-পা কেটে গেছে কিংবা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরা দূরের হাসপাতালে যাওয়ার আগে আমার কাছে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা নিত। ছোটখাট ইনজুরি নিয়ে আসলে স্টিচ দিয়ে দিতাম, নেবুলাইজ করা লাগলে বা বিপি অনেক কমে গেলে আইভি স্যালাইন দিয়ে দেয়া, ক্যানুলা করে দেয়া ইত্যাদি ছোটখাটও কাজও করে দিতাম। অনেক ডাক্তাররা এসব করতে চায় না— ছোট কাজ বলে, আমার এসব ভাবনা ছিল না। শেষরাতের রোগীদের আরেকগ্রুপ ছিল যারা তাদের রোগ নিয়ে লজ্জিত বা অন্য কেউ জেনে যাবে এমন চিন্তায় শংকিত। নানা ধরনের যৌন সমস্যা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদি।

এমন একদিন ঠিক সাড়ে এগারটায় একটা ত্রিশ পয়ত্রিশ বছরের লোক ঢুকলো চেম্বারে। লোকটার পায়ে বড় কোনো সমস্যা আছে, হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারলাম। গায়ে শীতের পোশাক অতিরিক্ত থাকায় পোস্চার দেখে রোগ অনুমানের চেষ্টা বাদ দিলাম। বসতে বলার পর সতর্ক চোখে পিছনে তাকিয়ে বেশ কষ্ট করে বসলেন উনি।

আমি প্রেসক্রিপশনের প্যাডে কলম ধরে বললাম, 'কী নাম?'

লোকটা ফিসফিস করে বললেন, 'আমিনুল স্যার।'

'বয়স?'

'তেত্রিশ।'

'কী সমস্যা বলেন?'

লোকটা কিছুটা চোরা হাসি দিয়ে বললেন, 'স্যার আপনার আমারে মনে রাখার কথা না, প্রতিদিন কত রোগী দেখেন। আমি অনেক খুঁজে আপনারে পাইছি।'

আমি এবার ভাল মত তাকে আবার দেখলাম। নাহ আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। এর আগে যদি কখনো রোগী হিসেবে দেখে থাকি তাহলেও সেটা সম্প্রতি না। আর এখানকার যে না তা ওর কথাতেই বোঝা যাচ্ছে।

'আপনে দুই বছর আগে আমার একটা অপারেশন করছিলেন।' লোকটা রহস্য ভাঙে অবশেষে।

বুঝতে পারলাম, দুই বছর আগে আমি যখন ইন্টার্নি করেছি সেসময় হয়তো উনি হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডের রোগী ছিলেন। হতে পারে আমাদের কোনো স্যার তার অপারেশন করছিলো, আমি সহকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি ভাবছেন আমিও সার্জন ছিলাম।

এই ব্যাপারে ভুল ভাঙানো অর্থহীন। তাই হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলেন কি! কী সমস্যা ছিল আপনার?'

'বাসে করে ঢাকা থেকে আসতেছিলাম, সিলেটের কাছাকাছি আসার পর একটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা লাগে। বাসটা দুমড়ায়-মুচড়ায় যায়। স্পট ডেড ছিল বারোজন।'

সাথে সাথে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সার্জারিতে প্লেসমেন্টের সময় বেশ বড় একটা বাস এক্সিডেন্ট হয়। সারারাত আমাদের যায় রোগীদের ইনজুরি রিপেয়ার করতে। ব্যাগ ব্যাগ রক্ত লেগেছিলো ব্লাড লস ঠেকাতে।

আমি বললাম, 'সেদিন তো যারা বেঁচে ফিরছে তারা সবাই ভাগ্যবান। আপনার ইনজুরি কেমন ছিল?'

'আমার হাত বাম কবজি থেকে আলাদা হয়ে গেছিলো।'

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। আবছা আবছা মনে পড়লো এ ধরনের একটা-দুইটা কেস পেয়েছিলাম। ভাস্কুলার সার্জন সামাদ স্যারের সাথে সেদিন এইরকম কয়েকটা কেসের সার্জারি করতে হয়েছে। কারো হাত কাটা পড়েছে, কারও পা, কারও...কারও দেহ এমনভাবে কাটা পড়েছিলো আমরা আর হাত দেইনি কোনো লাভ হবে না জেনে।

লোকটা বললেন, 'আমি যখন কিছুটা সুস্থ হই, তখন মেডিকেলে গেছিলাম। আপনাকে অনেক খুঁজছি, কিন্তু পাইনি।'

আমি বললাম, 'আমার সার্জারিতে চারমাসের প্লেসমেন্ট ছিল। পরে আর হাসপাতালে ডিউটি করি নাই। আপনার এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে?

এ প্রশ্নে উনি চাদর তুলে ঢেকে রাখা বা হাতটা আমাকে দেখালেন। দেখে আমি কিছুটা চমকালাম। কবজি থেকে জোড়া লাগানো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এবং মুভমেন্ট, স্কিন কালার সবই ঠিক আছে– তারমানে বেশ ভালভাবে হাতটা জোড়া লেগেছে। কিন্তু মনে হল হাতের আকৃতি কিছুটা অস্বাভাবিক, আঙুলগুলো বড় বড়, তালুটা ফোলা ফোলা।

উনি বললেন, 'হাতটা খুব সুন্দর জোড়া লাগছে ডাক্তার সাব। তবে সমস্যা হল এই হাত আমার না। অন্য কারো হাত আমার হাতে সিলাই করে দিছেন আপনারা।'

২.

আমি লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম। তার কাটা হাতে অন্য কারো হাতের অংশ লাগানোর যে দাবিটা তিনি করছেন সেটার সত্যতা যাচাই পরের বিষয়, কিন্তু এ মুহূর্তে তার উদ্দেশ্য কী সেটা ভাবছি। আমার কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া, না তার কোনো সমস্যা হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করা।

লোকটা যে দাবি করছে সে ধরনের কিছু ঘটা একদমই অসম্ভব। অ্যাকসিডেন্টে কারো হাত পা কাটা গেলে সেটা একজনেরটা আরেকজনের দেহে লাগানোর মত মাপ মত কাটা পড়ার চান্স নেই বললেই চলে। মানুষের দেহ তো লেগো সেট না। হাতটা কিছুটা অন্যরকম মনে হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা অন্য কিছু হবে–নিশ্চয়ই মেডিকেলীয় কোনো ব্যাখ্যা আছে।

আমি সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার হাত যে অন্য আরেকজনের সেটা মনে হল কেন?'

প্রশ্নে তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'নিজের হাত চিনমু না? মানুষ আর কিছু না চিনুক নিজের হাত-পা তো চিনে। তাছাড়া আপনারা যার হাত আমার হাতে লাগাইছেন সেই যাত্রীকে আমি খুঁইজা পাইছি।'

'খুঁজে পাইছেন? আমি অবাক হই।'

'জ্বি, আমি মোটামুটি যখন চলতে ফিরতে পারি তখন আমার সাথে বাসের যাত্রী কারা-কারা ছিল সেই খবর জোগাড় করি। বাস কাউন্টারের এক লোক ধরে তাদের ফোন নাম্বার পাই। তারপর সবার সাথে কথা বইলা নিশ্চিত হই সিলেট শহরে থাকা আরেকজন যাত্রী আছিল, তারও বাম হাত

কাটা পড়ছিলো। কিন্তু লোকটার আরো আঘাত ছিল, মাথায় শিক ঢুইকা গেছিলো।'

'মানে মারা গেছিলো?'

'জ্বি, তার বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ হয় আমার। সে বলল, তার ভাইয়ের কাটা হাত তারা পায় নাই। হাত ছাড়াই তারে কবর দেয়া হয়।'

আমি তর্কে গেলাম না। বললাম, 'আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে এখন?'

'সমস্যা তো হইতেছেই। এই হাত আমার নিজের মনে হয় না এইটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেক সার্জারির ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, তারা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। বলে, আপনার হাত না হইলে এইটা জোড়া লাগতো না।'

আমি তাতে সায় জানিয়ে বললাম, 'দেখেন কথা কিন্তু সত্য। আমাদের দেহ কিন্তু সহজে অন্যের কিছু নিতে চায় না, মানে ধরেন গাছের মত এক গাছের ডাল আরেক গাছের ডালে লাগিয়ে দিলাম আর সেইটা জোড়া লেগে গেল এমন কিন্তু মানুষের হয় না বললেই চলে! দেহে নতুন কোনো অঙ্গ লাগানোর কিছু দিনের মধ্যে দেহ সেইটা রিজেক্ট করার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়।'

তিনি বললেন, 'আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান তো আরেকজনের থেকে কিডনি নিয়া লাগাইছিলো, তাইলে হাত লাগানো যাইবো না কেন?'

হ্যাঁ সেটা হয়, কিন্তু ওই অপারেশন করার আগে যে কিডনি দিবে আর যে নিবে তাদের অনেক কিছু একরকম সেইটা পরীক্ষা করে নেয়া হয়, আর তারপর অনেক ধরনের ঔষধ পত্র দিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করা হয় যাতে দেহ সেইটা রিজেক্ট করতে না পারে। আপনার কিন্তু সেসব কিছু করা হয় নাই।

আমার কথা তিনি বুঝলেন কিনা জানি না, তবে সেটা যে সদুত্তর হিসেবে গ্রহণ করেনি তা বোঝা গেল। তিনি বরঞ্চ কিছুটা অনুরোধের সুরে বললেন, 'ডাক্তার সাব আমি হাতটা আর রাখতে চাই না। আমার সারাক্ষণ মনে হয় এইটা ওই মরা মানুষটার হাত, এই হাত আমারে গলা টিপা মারবো।'

আমি কিছুটা বিরতি দিয়ে বললাম, দেখেন আপনার হাতটা যদি এখন আবার কাটতে চান, তাহলে সেটা বেশ রিস্কি হবে। জীবন নিয়া টানাটানি পড়ে যেতে পারে।

তিনি তারপর হাতটা উঁচু করে ধরলেন, মনে হল তাতে তার বেশ কষ্ট হল। 'দেখেন, হাতটা কেমন সাইজেও বাড়তেছে, এইটা আমারে মাইরা ফেলবো।'

আমি এর উত্তরে কী বলবো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হাতটা কিছুটা ফোলা লাগছিলো সেটা সত্যি, তবে বড় হচ্ছে সেটা তার কল্পনা। খুব সম্ভবত কোনো ইনফেকশন হচ্ছে। আমি রোগীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করলাম। যা সন্দেহ করেছি– অ্যাকটিভ ইনফেকশন আছে। আমি কিছু ঔষধপত্র লিখে দিলাম যাতে ইনফেকশন প্রতিরোধ হয়। আর কয়েকটা পরীক্ষা লিখে সেগুলো করিয়ে দেখা করতে বললাম।

রোগী চলে গেল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে আমার মনেও কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো। এমনকি আসলেই হতে পারে যে আমরা অন্য কারো হাত তার হাতে লাগিয়েছি। সামাদ স্যার মেডিকেলের সেরা ভাস্কুলার সার্জন, পুরো দেশেই তার মত নিখুত কাজ করা লোক নেই। তিনি যদি আর কারো হাত লাগিয়েও থাকেন সেটা বোঝার উপায় থাকবে না। তবে জোড় করে ভাবনাটা সরিয়ে দিলাম, কারণ এমনটা হলে এক দুই সপ্তাহের মধ্যে দেহ ওই হাত রিজেক্ট করতো। এখনো থাকতো না তার দেহে।

৩.

একমাস পর আমিনুল আবারও আসলেন। সাথে অন্য একটি লোক। সেদিনও বেশ রাত হয়ে গেছে। চেম্বার থেকে বেড়ুবো এমন সময় তারা আসলেন।

দেখে বুঝলাম আমিনুলের অবস্থা ভাল না। চোখ মুখ ফোলা, বড় একটা চাদরে দেহ ঢাকা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সাথের লোকটি আমিনুলের ভাই। সে বলল, সে হাসপাতালে বা অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি না। তাই আমার কাছে এসেছে সেই গোয়াইনঘাট এলাকা থেকে।

আমিনুল নিজে কোনো কথা বলছে না। খুব সম্ভবত তার কথা বলতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ওনার ভাই বলল, 'স্যার আপনার ঔষধ খেয়ে কয়েকদিন ভাল ছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ ওর হাতটা তড় তড় কইরা বাড়া শুরু করছে। ক্ষেতের লাউ যেমন বাড়ে তেমন প্রতিদিনই বাড়তেছে।' বলে উনি চাদরটা সরায়।

আমি আতঁকে চেয়ার থেকে উঠে পড়ি। হাতটা প্রায় ওর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা হয়েছে। পাশেও বেড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা আলাদা পা।

আমিনুল কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম, দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওর কানের কাছে মুখ নিতে ও ফিসফিস করে বলল, 'স্যার হাতটা আমারে মাইরা ফেলতেছে। এইটা কাইটা ফেলেন এখনই।'

আমি সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে পাঠানোর চেষ্টা করলাম। ওর ভাই বলল, তারা নাকি মাঝখানে একবার গিয়েছিল, কিন্তু ওদের গোঁদ রোগের চিকিৎসা নেয়ার জন্য ঔষধ পত্র দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। ওর হাতে যে অন্য কারো হাত লাগানো তা কেউ বিশ্বাস করে নাই।

'আপনি যদি হাতটা কাইটা দেন স্যার সেইজন্য আসছি।'

আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, অ্যাম্পুটেশন করার জন্য খুব ভাল সার্জন লাগে এবং ভাল অপারেশন থিয়েটার লাগে। দুইটার কোনোটাই এখানে নাই। আর তাছাড়া কেটে ফেলাই যে সমাধান এইটা নাও হতে পারে। তাদের উচিত বড় হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে থাকা।

অনেক বোঝানোর পরও তারা কোনো হাসপাতালে যেতে রাজি হল না।

আমি শেষমেশ প্রেসক্রিপশনে রোগীর ডিটেইল হিস্ট্রি লিখে তাদের ধরিয়ে দিলাম। বললাম, এই প্রেসক্রিপশনটা যে কোনো সার্জারির ডাক্তারকে দিলে সে পুরো ঘটনা বুঝতে পারবে। আপনারা এটা নিয়ে এমন কারো সাথে দেখা করেন।

অনেক বোঝানোর পর তারা তাতে রাজি হল।

চেম্বার থেকে বেড়ুনোর সময় খেয়াল করলাম আমিনুলের বা হাতটা অন্তত অচল না। ও হাতে ভর দিয়ে খুব সহজেই দাঁড়ালো, পায়ের চেয়ে বেশি ভর যে হাতে দিচ্ছে তা স্পষ্ট। দেখে বুকটা কেমন ধক করে উঠলো।

৪.

এরপর আমিনুলের কোনো খোঁজ পাইনি দীর্ঘদিন। আমিও চেম্বার বদলে অন্য এক জায়গায় চলে এসেছি। একদিন আগের চেম্বারের ফার্মেসি মালিক আমাকে ফোন দিয়ে বলল, 'স্যার আপনাকে আপনার এক পুরান রোগী খোঁজে, এখানে আসছে। নেন একটু কথা বলেন।'

ফোনের ওপাশে গলা শুনেই বুঝলাম আমিনুলের ভাই।

'আমিনুলের কী অবস্থা এখন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'স্যার অবস্থা ভাল না। তারে নিয়া আমরা হাসপাতালে যাইতে পারি নাই। সে রাজি হয় নাই।'

আমি একটু হতাশ গলায় বললাম, 'জোর করে নিয়ে যেতে পারলেন না?'

'স্যার, তারে জোর করে নিয়ে যাওয়ার মত শক্তি আমাদের নাই।'

আমি একটু অবাক হলাম, 'কী বলছেন?'

'জ্বি, সে তার ঘর থেকেই বের হয় না। সারাদিন দরজা বন্ধ করে থাকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এভাবে চললে তো মারা পড়বে।'

'স্যার আপনি একবার বাড়িতে আসেন, সে শুধু বলে আপনার চিকিৎসা নিবে।'

আমি প্রথমে রাজি হইনা। কিন্তু লোকটা বেশ অনুনয় বিনয় করায় তার ঠিকানা নিয়ে রাখি। বলি, 'আচ্ছা সময় করে একদিন যাব।'

এরপর নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আমিনুলকে দেখতে যাওয়ার কথা আমার আর মনে থাকে না। প্রায় মাস ছয়েক পরে গোয়াইনঘাটে আমার একটা কাজ পড়ে যায়। কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে ফেরার পথে মনে পড়ে আরে আমিনুলের বাড়িটা এই এলাকাতেই। হয়তো দশ-বিশ মিনিটেই যাওয়া যাবে। একবার রোগীটা দেখে আসি।

আমিনুলদের বাড়িটা গোয়াইনঘাট শহরের শেষ মাথায়। একটা একতলা দালান, ছাদ টিনের। বাড়ির দক্ষিণ পাশে ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে, লোকেশনটা খুব নান্দনিক। একটু অস্বস্তি হচ্ছিলো এতদিন পর আসায় ওরা কী মনে করবে– হয়তো আমার উপর রেগেই আছে।

আমিনুলের ভাই বাড়িতে ছিল না, তার স্ত্রী বাড়ির দাওয়ায় চেয়ার পেতে দিলেন বসার জন্য। আমি আমিনুলের কথা জিজ্ঞেস করতে ভীত চোখে বললেন, সে তার রুম থেকে বের হয় না, জানলা দিয়া খাবার নেয়। ওনার ভাইও দরজায় তালা মাইরা রাখছে যাতে বের হইতে না পারে।

'স্যার, বাড়িতে থাকতে ভয় করে।'

'ভয় করে কেন?'

'সারারাত সে আওয়াজ করে, মনে হয় যেন ঘরের ভিতর একটা...'

ভদ্রমহিলা থামে, ইতস্তত করে। আমি বলি, 'কী মনে হয়?'

'মনে হয় একটা জন্তু ভিতরে।'

আমি চমকে উঠি ভিতরে ভিতরে, সেটা প্রকাশ না করে বলি, 'ওনার হাতের কী অবস্থা?'

'হাত অনেক বড় হইছে, তবে এখন কী অবস্থা জানিনা। গত তিনমাস ধরে তারে আমি দেখি নাই। তার ভাই মাঝে মধ্যে ওই রুমে ঢুকে কথাবার্তা বলে, বড় কোনো প্রয়োজন হইলে সেই ঢুকে।'

আমি বললাম, 'আমি তো চলে যাব। আমি চাচ্ছিলাম আমিনুলকে একবার দেখতে।'

আমার কথায় ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি ঢুকবেন ওই রুমে?'

'আপনার কাছে চাবি আছে না?'

'আছে। তবে, উনি আসলে ঢুকেন, আপনার ডর করবে।'

আমি হেসে বললাম, 'না ডর করবে না। উনি তো আমার রোগী, তাছাড়া ওনার ভাই কখন আসবে তার তো ঠিক নেই। আমার আবার ফিরতে হবে।'

আমার কথায় উনি শেষমেশ বাড়ির ভেতর থেকে চাবি নিয়ে এলেন। তারপর বাড়ির পেছনে একটা আলাদা তৈরি করা রুমের সামনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা আর থাকলেন না, বললেন আমি থাকলে ওনার ভাই রাগ করবে। আমাদের এই ঘরে ঢোকা নিষেধ। আপনার রোগী দেখা শেষ হলে আবার তালা মাইরা চাবি আমাকে দিয়ে যাইয়েন।'

রুমটার সামনে একলা দাঁড়িয় আমি একটু থমকে যাই। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যার শুরু হচ্ছে হচ্ছে, আকাশের অবস্থাও ভাল না।

পরিবেশের কারণেই হয়তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। ঘরটা মূল বাড়ির মতই একতলা, ইটের দেয়াল আর দরজা জানালা লোহার পাতে তৈরি। উপরে লাল টালির ছাদ। মহিলা যেমনটা বলছিলেন, ভিতরে একটা মৃদু ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে, আর ফোস ফোস নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ। মনে হল, দরজার ওপাশে কোনো এক শ্বাপদ ঘাপটি মেরে আছে।

জোর করে মাথা থেকে এই অশুভ চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে আমি দরজাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেলি।

দরজা খুলতেই একটা অচেনা গন্ধ নাকে এসে লাগে, কড়া গন্ধ। দেখলাম ভিতরে কোনো আলো জ্বলছে না। আমি দরজায় একটু আঘাত করে মৃদু গলায় বললাম, 'আমিনুল! আমি ডাক্তার আসিফ। আপনাকে দেখতে এসেছি।'

সাথে সাথে ভিতরে একটা হুটোপটি শুরু হয়ে গেল। মনে হল ভিতরের কোনো আসবাব মট করে ভেঙে গেল, তারপরই খোলা দরজা দিয়ে ভীষণ আক্রোশে একটা বিশাল মূর্তি বেড়িয়ে এল।

'মাই গড!' আমি এটা কী দেখছি।

প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু যে প্রাণীটা বেড়িয়ে এল তাকে মানুষ বলার কোনো উপায় নেই। একটা মাথা বোঝা যাচ্ছে এবং মাথাটা আমিনুলের সে ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। তবে দেহটা মোটেও চেনা কোনো প্রাণীর সাথে মেলানো যায় না। মাথাটা যে দেহে বসে আছে সেটা থেকে মাকড়শার মত পাঁচটা পা বেড়িয়ে আছে। প্রতি পায়ে চতুষ্পদের মত খুড়, তবে বেশ বড়সড়।

দরজা দিয়ে কোনোমতে দেহটা বের করে ওটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সামনের দুটো পা আমাকে যেন আঁকড়ে ধরলো। পেছনের তিনপায়ে ভর করে ওটা দাঁড়িয়ে আমাকেও শূন্যে তুলে ফেলে।

এরপর জন্তুটা ওর মুখ আমার মুখের সামনে নিয়ে আসে। আমি ভীষণ ভয়ে জমে গিয়ে দেখি আমিনুলের মুখটাই আকৃতিতে প্রায় তিনগুন হয়ে গেছে। কালচে দুটো চোখ আমার চোখে দৃষ্টি রেখে ঘড়ঘড়ে গলায় কিছু একটা বলে। তবে সেটা আমার কানে একটা জান্তব গর্জন ছাড়া আর কিছু মনে হয়না।

ঠিক এমন সময় পাশ থেকে একটা আগুনের হল্কা টের পাই। দেখি আমিনুলের বড় ভাই আর তার স্ত্রী একটা লাঠিতে মশালের মত আগুন নিয়ে আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে।

তাতে যেন জন্তুটা আরো খেপে উঠলো, আমাকে উপরে তুলে প্রায় দশহাত দূরে ছুঁড়ে ফেললো।

তারপর আমিনুলের বড় ভাই আর তার স্ত্রীর সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

আমিনুলের বড় ভাই হঠাৎ আগুনটা ফেলে দিয়ে ওর আরো কাছে গিয়ে দাড়ালো। তারপর কী যেন বলে ওর গায়ে হাত বোলালো কিছুক্ষণ।

আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম, উনি বলছেন, 'ডাক্তার সাহেবের কোনো দোষ নাই। ডাক্তার সাহেবের কোনো দোষ নাই।'

তাতে মনে হল আমিনুল শান্ত হল। একবার ঘাড় ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

কী ভয়ংকর সে দৃষ্টি!

তারপর এক ঝটকায় আবার পাঁচ পায়ে দাড়ালো। তারপর ঘুরে মাকড়শার মত করে দ্রুত পায়ে পাশের জঙ্গলের দিকে রওনা হল। আমিনুলের ভাই তাতে আর বাঁধা দিল না। তার স্ত্রীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি দূর থেকে জন্তুটার অবয়ব দেখে নিশ্চিত হলাম, আমিনুলের হাতটাই এখন দেহ হয়ে গেছে, দেহের বাকি অংশ হাত গ্রাস করে ফেলেছে শুধু মাথা বাদে। হাতের প্রতিটা আঙুল এক একটা পায়ে পরিণত হয়েছে।

জন্তুটা অন্ধকার জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আমিনুলের দেহ অন্য আরেকজনের হাত রিজেক্ট করেনি, বরঞ্চ হাতটাই ওর বাকিদেহটা ক্রমশ রিজেক্ট করেছে।


প্যারাসাইট

কয়েকমাস আগের ঘটনা। ল্যাপটপের ব্যাটারিতে সমস্যা হচ্ছিলো, সিলেটে গেলাম সারাতে। জিন্দাবাজারের কম্পিউটার মার্কেট থেকে বের হয়ে রাস্তায় এক দোকান থেকে চা খাচ্ছি।

হঠাৎ খেয়াল করলাম রাস্তার অন্যপাশে ছোট একটা ক্লিনিকের মত। সুহৃদ নার্সিং হোম। একটা বহুতল ভবনের দোতলায় সাইনবোর্ডটা টাঙানো। পাশে কয়েকজন ডাক্তারের নাম আর তারা কী বিষয়ে স্পেশালিস্ট সেসব সম্বলিত ছোট ছোট বোর্ড।

প্রথম বোর্ডটায় চোখ আটকে গেল। ফারজানা ইয়াসমিন বাবলি, গাইনি এন্ড অবস, সহকারী অধ্যাপক, এফসিপিএস, এমসিপিএস।

বাবলি! এখানে রোগী দেখছে। ঝপ করে কলেজ জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। বাবলির সাথে খুব রেষারেষি ছিল একসময়ে, প্রায় এক্সামে ও হত সেকেন্ড আর আমি হতাম ফার্স্ট। মাঝে মধ্যে উল্টোটা। ও আমাকে যেমন দু'চোখে দেখতে পারতো না, আমিও না। আমি যখন ফাইনাল প্রফে অ্যাপিয়ার করতে পারলাম না, ও নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিল। মেডিসিন, সার্জারি গাইনি তিনটাতেই ও ফার্স্ট হয়েছিল। গোল্ড মেডেল পেয়েছিল কলেজ থেকে। আমি থাকলে নিশ্চয়ই সেটা মিস হতো-অন্তত মেডিসিনে মিস হতো সেটা শিওর।

বাবলির জায়গায় অন্য কোনো ক্লাসমেট থাকলে হয়তো ভিতরে ঢুকে খোঁজ নিতাম, কারণ কলেজ লাইফে অসামাজিক ছিলাম সেটা কেউ বলতে পারবে না। বাবলির সাথে দেখা হোক সেটা চাচ্ছি না। দেখা হলে নিশ্চয়ই বাঁকা হাসি হাসবে, মনে মনে বলবে- পাঁচ বছর আমার সাথে বহু লড়াই করেছো বাপু, লাভটা কী হলো। ওই তো ঔষধের দোকানে বসে রোগী দেখো। আর আমি মেডিকেলের প্রফেসর।

চিন্তাটা আমি জোর করে সরিয়ে দিলাম, হয়তো এসব কোনো কিছুই ও ভাববে না। আমি যে সুস্থ আছি মানসিক ভাবে, অন্তত রোগী দেখতে পারছি সেটাতেই আমার কাছের বন্ধুরা খুশি। আর কোনো ডিগ্রী না থাকলেও আমার মেডিকেলীয় জ্ঞানের দখল নিয়ে কারো সন্দেহ নেই। এখনো অনেকেই কোনো ডায়াগনোসিসে আটকে গেলে আমাকে ফোন করে। ফোনে শুনে শুনে রোগের ধাঁধায় আটকে থাকা কত জনকে এখনো পথ

বাতলে দেই, যারা হয়তো ওসবে ইতিমধ্যে কয়েকবছর পোস্টগ্রাড করে ফেলেছে। এসবে মাঝে মধ্যে মনে হয়, এই তো বেশ আছি। আরো চার পাঁচবছর খাটিয়ে নতুন আর কী-ই বা শিখতাম, বিশেষত আমার আগ্রহের জায়গা যেটা সেই মেডিসিনে। আমাদের স্যাররাও কেউ কেউ বলতেন, ঠিকঠাক যদি এমবিবিএসের সময়টা কাজে লাগাও, তাহলে দেখবে সবই তুমি জেনে গেছো। তবে হ্যাঁ সবই যে জেনে যাইনি, তার প্রমাণ স্বরূপ নানা অচেনা অজানা কেসের মুখোমুখি হই। যেমনটা হয়েছিলাম বাবলির ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এসে।

বাবলিকে এড়ানো গেল না। চায়ের দাম চুকিয়ে ফিরতে যাব এমন সময় একটা ছেলে এসে কাঁধে টোকা দিল। খুব বিরক্ত হলাম, কেউ আমাকে স্পর্শ করলে আমার সহ্য হয় না, তাছাড়া কাঁধে টোকা দেয়ার কী আছে, মুখে বললেই হয়। আমার বিরক্তি অগ্রাহ্য করে ছেলেটা বলল, ম্যাডাম আপনার সাথে দেখা করতে চায়! এ যে কোনো ম্যাডাম সেটা বুঝতে আর বাকি থাকে না। হয়তো জানালা দিয়ে আমাকে দেখেছে।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম-তোমার ম্যাডামকে গিয়ে বলো আমার একটু তাড়া আছে, আরেকদিন আসবো। কিন্তু পরক্ষণে দেখি বাবলি স্বয়ং রাস্তার ওপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। টং দোকান বলে হয়তো নিজে না এসে দাড়োয়ানকে পাঠিয়েছে। না দেখা করে যাওয়া আর সম্ভব না।

২.

'আসিফ, তুই তো একদম লাপাত্তা। কারো সাথে তোর যোগাযোগ নাই।'

আমি বিব্রত হেসে বলি, 'তা ঠিক। কারো সাথে দেখা হয় না। আর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি না বলে কারো খবরও নেই আমার কাছে।'

'তুই যে সিলেটে এটাও আমার ধারণা আমাদের তেমন কেউ জানে না। প্র্যাকটিস করছিস সেটাও না।'

'হ্যাঁ রোগী দেখি। ওই একটা কাজ তো পারি। আর আমার ধারণা রোগ-রোগী এসব নিয়ে ভাবলে আমার সময়টা কেটে যায়।'

বাবলি এবার সেই অস্বস্তিকর প্রসংঙ্গটা আনলো, 'আসিফ তুই কত ভাল স্টুডেন্ট। কেন আর কিছু করছিস না।'

'কী করবো।' আমি হেসে বলি।

'কেন তুই বসলেই তো এফসিপিএস হয়ে যেত, কিংবা অন্য যে কোনো ডিগ্রী।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আরে না। আমার আসলে এখন কোনো ট্রেনিং করা পোষাবে না। আমার ধারণা ট্রেনিংয়ের চাপে পড়লে পুরান সমস্যাটা ফিরে আসবে। তাছাড়া, আমি এভাবেই ভাল আছি। সবাই কি বড় ডাক্তার হয় বা হওয়ার কি প্রয়োজন আছে?'

বাবলি সেটা মেনে নিতে পারে না, 'তুই অলরেডি অনেক বড় মাপের ক্লিনিশিয়ান। এটা আমাদের ব্যাচের সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।'

বাবলি মুখে এসব কথা শুনে অবাক হই। বোঝার চেষ্টা করি, এসব কথা করুণা করে বলছে কিনা। কিংবা হতে পারে এতদিনে ও পাল্টে গেছে।

আমি উশখুস করি। বলি, 'আজকে উঠি।'

'উঠবি মানে, নাস্তা আনতে বলেছি। চা-টা খাবি। তারপর যাবি।'

আমি তারপরও ওঠার চেষ্টা করি। 'আরেকদিন আসবো, হাতে কিছু কাজ আছে।'

বাবলির মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো। 'বুঝতে পারছি, তুই বিশ্বাস করিস নাই আমাকে। ভাবছিস তোকে স্বান্তনা দেয়ার জন্য এসব বলছি। তাই পালাতে চাচ্ছিস!'

ওর কথায় এবার থমকে আবার বসে পরি। নিজেকে অহেতুক প্যারানয়েড মনে হচ্ছে। আচ্ছা, নাস্তা খেয়ে বিদায় নিচ্ছি।

বাবলি আগের কথার সূত্র ধরে বলতে থাকে, 'গত বছর রিইউনিয়নে তুই তো এলি না। কত জন তোর কথা বলল। ওরা এখনো নাকি কোনো ডায়াগনসিসে আটকে গেলে তোর হ্যান্ড নোট পড়ে সূত্র খোঁজার ট্রাই করে।'

কলেজে মেডিসিনের হ্যান্ডনোটটা ক্লাসমেট জুনিয়রদের খুব প্রিয় ছিল। ফটোকপি দোকানদার বাতেন ভাই একদিন বলেছিল, ভাই এইটার একটা ছাপা কপি বের করে গাইড বানায় দেন। আমার দোকানে থাকলেই দেখবেন হাজার কপি বিক্রি হইবো। নাইলে পারমিশন দেন, আমি ছাপায় দেই। বাতেন ভাইয়ের প্রকাশক হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আমার গাইড-বইয়ের লেখক তকমা পাওয়ার দূরতম ইচ্ছা ছিল না। তাই এখনো সেটা হ্যান্ডনোট হিসেবেই সম্ভবত আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যে সিলেটে আছি সেটা তুই কীভাবে জানিস?'

'গেজ হাউ! মাস ছয়েক আগে এক রোগী আমার চেম্বারে আসে। তোর একটা প্রেসক্রিপশন পাই তার কাছে। অবশ্য তোর নাম না দেখে ডায়াগনসিস দেখেই বুঝেছি এটা তোর প্রেসক্রিপশন।'

'মানে?'

'অ্যাবডোমিনাল মাইগ্রেন এর কেস। এমন ডায়াগনসিস আর কে করবে তুই ছাড়া সেটা ভাবছিলাম।'

আমি হাসলাম। মাথার মাইগ্রেন ছাড়া অন্য কোনো মাইগ্রেন সহজে কেউ ডায়াগনসিস করতে চায় না। একবার অ্যাবডোমিনাল মাইগ্রেন ডায়াগনসিস করে মেডিসিন ওয়ার্ডে স্যারের ঝাড়ি খেয়েছিলাম. স্যারের মতে আমি জ্ঞান জাহির করতে এমন রেয়ার একটা ডায়াগনসিস লিখেছি। বাবলি সেই ঘটনার সাক্ষী ছিল।

এরমধ্যে চা চলে এল। সাথে সামনের দোকান থেকে গরম সিঙারা।

খেতে খেতে বাবলি বলল, 'তোকে দেখেই আমার একটা ব্যাপারে আলাপ করতেও মন চাইলো, তাই তুই যাতে পালাতে না পারিস সেজন্য নিজেই ধরে নিয়ে এলাম।'

আমি একটু অবাক হলাম, 'কী ব্যাপার?'

বাবলি একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'হসপিটালে একটা অ্যাটিপিকাল কেস আছে। এ ধরনের কেস আমি আগে কখনো পাইনি বা বইপত্রেও চোখে পড়েনি।'

আমি বেশ আগ্রহী হলাম কথাটা শুনে। একটা অ্যাটিপিকাল কেস আমাকে যতটা আগ্রহী করে ততটা বোধহয় আর কোনো কিছুই করে না।

'কী রোগী?'

'চল দেখবি, চা শেষ করে নে।'

আমি চায়ের কাপ রেখে উঠে পড়ি, 'চল! চা লাগবে না। একটু আগেই তো এককাপ খেলাম।'

বাবলি হেসে বলল, 'আচ্ছা চল।'

জেনারেল ওয়ার্ড পেরিয়ে আমরা আরেক ফ্লোর উপরে উঠি। এখানে সারি সারি কেবিন করিডোরের দু'পাশে। ক্লিনিকটা বেশ ব্যস্ত সেটা টের পাওয়া গেল। নার্সরা এককুম থেকে আরেককুমে ঔষধের ট্রলি নিয়ে ছোটাছুটি করছে। দুইজন ডিউটি ডাক্তার হিমশিম খাচ্ছে। আমরা ফ্লোরের একদম শেষপ্রান্তে চলে এলাম।

বাবলি বলল, 'এগুলা ভিআইপি কেবিন, বেশিরভাগ সময় খালি থাকে। যে রোগীর কথা বলছিলাম তাকে আপাতত এখানে রেখেছি একটু নিরিবিলি যাতে রাখা যায় সেজন্য।'

বাবলি উপরে উঠতে একজন নার্স আমাদের পিছু পিছু এল। বাবলি তাকে বলল, 'সিস্টার, দেখেন আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আপনি ভিআইপি কেবিনের ফাইলটা নিয়ে আসেন। তারপর রোগীর রুমে যাই।'

সিস্টার দ্রুত ফাইলটা আনতে চলে গেল।

বাবলি কেবিনের সামনে পায়চারি করতে করতে বলল, 'তোর সাথে আগে প্যারাসাইট বিষয়ক একটা আলোচনা সেরে নেই, তোর মতে প্যারাসাইট বলা যায় কাকে?'

প্যারাসাইট! আমি থমকালাম। তারপর বললাম, 'প্যারাসাইট বিষয়ে তো থার্ড ইয়ারে থাকতে পড়েছিলাম বিস্তারিত। তুই কী ডেফিনেশন শুনতে চাস?'

'ডেফিনেশন না, তুই এমনিতে বল প্যারাসাইট বলার জন্য কী কী শর্ত লাগে?'

'ওয়েল, প্রথমত হোস্টের দেহের নিউট্রিশনের উপর নির্ভরশীল এবং হোস্টের কোনো কাজে লাগছে না বা হোস্টের জন্য ক্ষতিকর এমন জীব।'

'ওকে, তাহলে মানুষের বাচ্চাকে কি প্যারাসাইট বলা যাবে? ফিটাস মূলত মায়ের নিউট্রিশনের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিবছর সন্তান জন্মদিতে গিয়ে অনেক মা মারা যায়।'

আমি হেসে বললাম, 'কাইন্ড অব। তবে এক্সপেক্টেড প্যারাসাইট। মা তো চাচ্ছে সন্তান তার নিউট্রিশন নিক, শুধু চাচ্ছেই না যাতে ঠিকঠাক নিউট্রিশন পায় তারজন্য এক্সট্রা সাপ্লিমেন্টও নেয়।'

'যদি না চায় সেক্ষেত্রে কি তাহলে প্যারাসাইট হয়ে যায়?'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'না, তাও হয় না। কারণ প্যারাসাইট তো মূলত অন্য কোনো জীব। ধরা যাক, একই প্রাণীরা পরস্পরের থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছে, তাদের প্যারাসাইট বলা ঠিকহবে না। কারণ তখন হোস্ট আর প্যারাসাইট বায়োলজিক্যালি সেম, একটাকে হোস্ট বললে অন্যটাকেও হোস্ট বলতে হবে।'

'ওকে, তারমানে ফিটাসকে আসলে প্যারাসাইট বলাটা অন্যায় হবে।'

আমি ওর কথায় কিছুটা দ্বিধান্বিত হলাম। ও আসলে কী কেসের কথা ভাবছে সে ব্যাপারে আগ্রহী হলাম, 'কেসটা কিসের?'

'অবসট্রেটটিক কেস তো বটেই, তবে খুব সম্ভবত এটা আর আমার স্পেশালাইজেশনের ভিতরে আর নেই।'

ইতিমধ্যে ... করে কী কী
যেন জিজ্ঞেস করে নিল।

কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে প্রথমেই যে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলাম রুমটা আসলেই ভিআইপি রোগীর জন্য বানানো। বেশ বড় রুম, প্রয়োজনীয় আসবাবে সুসজ্জিত, মাঝখানে শুধু রোগীর বেডটা না থাকলে এটাকে মোটামুটি দামী কোনো হোটেলের কোনো স্যুইটের সাথে অনায়াসে তুলনা করা যেত। বেডে যে রোগী শুয়ে আছেন তিনি বছর তিরিশের একজন নারী। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে রোগী ভীষণ অ্যানেমিক, রঙ ফর্সাকারী বিজ্ঞাপনের মডেলের মত সাদা হয়ে আছে মুখ। বেডের পাশে স্টান্ড থেকে একটা ব্লাড ব্যাগ ঝুলছে, তারমানে রক্তসল্পতার চিকিৎসা ইতিমধ্যে চলছে।

'হিমোগ্লোবিন কত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন ছয় দশমিক সাত'

আমিও এত কম কোনো সংখ্যা ধারণা করছিলাম।

বাবলি বলল, 'এক দুই সপ্তাহ পর পর ব্লাড দেয়া লাগছে।'

'এখন কেমন লাগছে?' বাবলি রোগীর মাথার কাছে গিয়ে হাত রাখে কাঁধে।

'জ্বি, আগের চেয়ে ভাল।' একটা দুর্বল ক্ষীণ গলায় রোগী যেন বাবলিকে আশ্বস্ত করে। মেয়েটা আড়চোখে আমাকেও একবার দেখে।

বাবলি আমার দিকে আল্ট্রাসনো আর ব্লাড রিপোর্ট এগিয়ে দেয়। আমি উল্টে পাল্টে দেখি, বাবলির কাছে কেসটা কেন অ্যাটিপিকাল সেটার কিছু ক্লু পাই।

'একটোপিক প্রেগনেন্সি বুঝলাম, দুইটাই?'

'হ্যাঁ দু'টা বাচ্চাই অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে।'

'২৭ সপ্তাহ! তারমানে ভাল সম্ভাবনা আছে টিকে যাওয়ার!' আমি বিস্মিত গলায় বলি।

বাবলি তাতে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'বাচ্চাগুলো কেমন আছে?'

'সারপ্রাইজিংলি, দুটো বাচ্চাই ভাল আছে। তবে দেখতে পাচ্ছিস, মেয়েটার অবস্থা ভাল না।'

কেসটা বেশ দুর্লভ সেটা না স্বীকার করে উপায় নেই। একটোপিক বা জরায়ুর বাইরে মাঝে মধ্যে নানা কারণে ভ্রূণ চলে যায়, এটা একটা প্রসূতি-

উৎপাত বলা চলে, যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে মায়ের জন্য এবং সার্জিক্যাল অপারেশন জরুরি হয়ে পরে। একটোপিক প্রেগনেন্সি হলে বাচ্চা সাধারণত বাঁচে না, জরায়ুর মত চমৎকার জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিলে বাঁচার কথাও না। ভ্রুণের এই অবিবেচক ভ্রমণ তাই কিছুটা আত্মঘাতী। তবে অসচরাচর কেস হলে-জরায়ুর বাইরে থাকা সত্ত্বেও ভ্রূণ মানব শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ডাক্তারদের তখন পলাতক ভ্রুণ যে স্থানে নানা সুযোগে ভ্রমণ করে থিতু হয়েছে, সেখানে অপারেশন করতে হয়-সেখান থেকে বাচ্চাকে ঘাড় ধরে ধরাধামে ফেরত বা ভূমিষ্ঠ করতে হয়। কিন্তু দুটো বাচ্চা একটোপিক হওয়া এবং সেগুলো টিকে যাওয়া বেশ দুর্লভ এবং মায়ের জন্য ভীষণ বিপজ্জনকও। একটোপিক বাচ্চা আবার জরায়ুর পাশের ফেলোপিয়ান টিউব, ওভারি ইত্যাদি ছেড়ে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে আশ্রয় নিয়েছে সেটা আরও দুর্লভ, বাচ্চার প্লাসেন্টা এসব ক্ষেত্রে পেটের অভ্যন্তরের একটা লেয়ারে তৈরি করে, অর্থাৎ পেটের ওই অংশই জরায়ুর মত কাজ করে। এমন কেস জানা ইতিহাসে হয়তো একটা কি দুটো পাওয়া যেতে পারে।

রোগী দেখে আমরা বেড়িয়ে করিডোরে ফিরে এলাম। মেয়েটা কেবিনে একা ছিল। সে ব্যাপারে জানতে চাইলাম।

'মেয়েটার আত্মীয় স্বজন?'

'এখানে কেউ আসে নি।'

'মানে?'

'ওরা চায় না এই বাচ্চাগুলো। প্রেগনেন্সির খবর পাওয়ার পরপরই ওরা অ্যাবোরশনের জন্য মেয়েটাকে চাপ দিচ্ছিলো।'

'তারমানে? মেয়েটার হাজবেন্ড?'

'হাজবেন্ড নেই, যে ছেলে বাবা সেও লাপাত্তা। কমন কেস। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই অ্যাবোরশন করাবে না।'

'মেয়েটার অভিভাবক হিসেবে কে আছে তাহলে?'

'ওর বোন। তবে ওই মেয়েটা হাসপাতালে সহজে আসতে পারে না। ফোনে যোগাযোগ রাখে আর কয়েকদিন পর পর এসে দেখে যায়। মেয়েটার পরিবারের আর কেউ জানে না ও এ হাসপাতালে। ইনফ্যাক্ট ওরা যদি খুঁজে পায়, মেয়েটা এ হাসপাতালে তাহলে ধরে নিয়ে যাবে। বাচ্চাগুলো মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। মেয়ের ফ্যামেলি পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল। যদি খুঁজে পায় প্রয়োজনে মেয়েটাকেও মেরে ফেলবে কিন্তু এই কেলেংকারি ঘটতে দেবে না।'

আমি বেশ অবাক হলাম। বাবলি বেশ ভয়ংকর কাজ করছে। ওর সাহস আছে বলা যায়।

'বুঝলাম, এজন্যই ভিআইপি কেবিনে এত রাখঢাক করে রাখা!'

'হুম, কাইন্ড অফ। তবে এভাবে কয়দিন রাখতে পারবো জানি না। আর মেয়েটার যে কন্ডিশন চলছে সেটাও একটা বড় আশংকা।'

আমি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি, 'খুব ক্লোজ মনিটরিং করলে হয়তো বিপদ হবে না। এ ধরনের কেস কিন্তু লিটারেচারে আছে সেটা তুই তো ভাল জানিস।'

'হ্যাঁ, আমার দুঃশ্চিন্তার ব্যাপার টুইন বাচ্চা বলে। এ্যানেমিক হার্ট ফেইলিয়রের একটা বড় সম্ভাবনা আছে। প্রতি সপ্তাহে সিভিয়র অ্যানেমিক হয়ে যাচ্ছে।'

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে আমি বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে যাই।

তবে কেসটার ফলোআপ করতে হবে।

হয়তো এ ধরনের কেস জীবনে একটাই দেখার বা জানার সৌভাগ্য হবে।

৩.

নিজ থেকে ফলোআপ করতে হল না। এক সপ্তাহ পরেই বাবলিই একদিন আমাকে ফোন দিল, 'আসিফ, হেল্প লাগবে। একটা ঝামেলা হয়েছে!'

প্রথমে মনে হল-ওই রোগীর কিছু হল কি।

'ওই রোগীর ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, রোগীকে এ ক্লিনিকে রাখা যাচ্ছে না। ওর পরিবার জেনে গেছে।'

'কীভাবে?'

'ওর বোন রেগুলার দেখতে আসে। বাকিদের চোখ এড়িয়ে আসতো। কোনোভাবে ওরা সন্দেহ করে পিছু নিয়েছিলো।'

'ওরা কি নিয়ে গেছে পেশেন্টকে?'

'উহু, পেশেন্টের বোন টের পেয়েছিলো। সাথে সাথে আমরা পাশের আরেকটা ক্লিনিকে রোগীকে ট্রান্সফার করে দেই। পরিবারের লোকের হাতে পড়লে এই পেশেন্টকে ওরা হাসপাতালেই রাখবে না। মেরে ফেলবে।'

'অনার কিলিং?'

'হ্যাঁ। তোর কাছে যে হেল্প দরকার সেটা হল-আশেপাশের ক্লিনিকেও এ রোগী রাখা ঠিক হবে না। ওরা খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। আমি চাচ্ছি দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলতে।'

'আমার এখানে?'

'হ্যাঁ, তোর ওখানের কোনো ক্লিনিক যেখানে ওটি আছে।'

'সেটা আছে, তবে বুঝতেই পারছিস শহরের মত আধুনিক হবে না। আর কোনো স্থায়ী সার্জনও নেই। সবাই সিলেট থেকে এসে সার্জারি করে।'

'ওতেই হবে। আর সার্জারি যখন লাগবে সেটা তো আমিই করবো। তুই শুধু ক্লিনিকের সাথে কথা বলে রাখ। আমি এক-দুইদিনের ভিতরে রোগীটা পাঠিয়ে দিব। তোর কষ্ট করে রোগীটাকে একটু চেক-আপ করতে হবে।'

'সেটা তুই না বললেও আমি করবো। এরকম একটা কেস!'

'থ্যাংকিউ!'

ফোনটা রেখে আমি এখানকার ক্লিনিক মালিক ডাক্তার শরীফ সাহেবের সাথে দেখা করলাম। শরীফ সাহেবের বয়স সত্তরের কাছাকাছি, পুরনো আমলের ডাক্তার। আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তার ক্লিনিকের আরএমও পোস্টে থাকার জন্য মাঝেমধ্যে বলেন। কিন্তু হাসপাতালে ডিউটি করার আগ্রহ পাইনা বলে সে প্রস্তাবে রাজি হই না। বহুবছর আগে এ এলাকায় একটা ক্লিনিক দিয়েছিলেন। নিউ মডেল ক্লিনিক। পুরনো হলেও নামের 'নিউ' স্বভাবতই বজায় রয়েছে। তার সাথে কথা বলে একটা কেবিনের ব্যবস্থা করে রাখলাম। ক্লিনিকে রোগী আসছে তাতেই তিনি খুশি, তাছাড়া আমি ফলোআপ করবো সেটা শুনে ভরসাও পেলেন।

পরদিনই বাবলি একটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে রোগীটা পাঠিয়ে দিল। রোগীর সাথে ওর বোন এসেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সি এক তরুণী। মেয়েটার চোখে মুখে আতংক। খুব সম্ভবত পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। আমার সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ হলো। মেয়েটার নাম তিন্নি। আমি ভরসা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম-বাবলির অধীনে যেহেতু আছে তারমানে বেস্ট কেয়ার পাবে।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের হওয়ার পর রোগী দেখে আমিও কিছুটা শংকিত হলাম। মেয়েটার অবস্থা ভাল না, এখনো বেশ অ্যানেমিক। বাবলি বলেছিল-গতকালই নাকি একব্যাগ ব্লাড দেয়া হয়েছে। তারপরও খুব একটা কারেকশন হয়নি। হিমোগ্লোবিন সাত এর বেশি হবে না মনে হচ্ছে। দুইটা

বাচ্চার কারণে স্বভাবতই হাঁসফাস করছে, পায়ে পানি এসেছে। বেড়ে পৌঁছানোর পর আমি একটা ফলোআপ দিলাম। বিপি এবং অন্যান্য ভাইটাল নরমাল পেলাম। এটা ভাল ব্যাপার।

বাবলির সাথে ফোনে আলাপ হতে জানালো-এই সপ্তাহেই অপারেশনটা করে ফেলতে হবে। তা না হলে পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাবে। আমিও তাতে সায় দিলাম। জানালাম সব কিছু রেডি আছে। যেকোনো দিনই করে ফেলা যাবে।

বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। তিন্নিকে ফোন নাম্বার দিয়ে এলাম যাতে যেকোনো সময় যোগাযোগ করতে পারে। মেয়েটা প্রথমে যেমন ভয় পাচ্ছিলো এখন সেটা কমে গেছে। এই মফস্বলে হয়তো এতটা ভাল ব্যবস্থা থাকবে সে আশা করেনি।

***

রাত দশটার দিকে রোগী দেখা শেষ করে বাজারের দোকানে চা খাচ্ছি এমন সময় তিন্নির ফোন পেলাম।

'আপু কেমন যেন করছে!'

ক্লিনিক যেহেতু কাছেই আমি আর কথা বাড়ালাম না। 'আসছি', বলে রওনা হয়ে গেলাম। ক্লিনিকে পৌঁছে দেখি আজকে ডিউটি ডাক্তার হিসেবে আছে রবি, রবি আমার কয়েক বছরের জুনিয়র, আমারই মেডিকেলের। আমাকে দেখে বলল, ভাই রোগী বেশ ক্রিটিক্যাল মনে হচ্ছে। ফিটাল হার্টরেট কমে যাচ্ছে। দুই বাচ্চা তো, বোঝাও ডিফিকাল্ট, তবে একটা বাচ্চার হার্ট-রেট একদমই পাচ্ছি না।

আমি কথা না বাড়িয়ে ওর থেকে স্টেথো নিয়ে রোগীর রুমে ঢুকে গেলাম। তিন্নিকে দেখে বুঝলাম ঝড় বয়ে যাচ্ছে মেয়েটার উপর দিয়ে। রোগী যন্ত্রনায় কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে আছে।

আমি পেটে স্টেথো লাগিয়ে বাচ্চাগুলোকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম, ডান পাশের বাচ্চাটার অবস্থা আসলেই খারাপ মনে হল।

আমি আর দেরি না করে বাবলিকে ফোনে জানালাম।

বাবলি মনে হল এমন একটা ফোন পাওয়ার জন্য প্রস্তুতই ছিল। বলল, 'আসিফ, আমার আসতে ঠিক আধা ঘন্টা লাগবে। আমি সাথে একজন অ্যাসিট্যান্ট আর অ্যানেস্থেসিস্ট নিয়ে আসছি। ক্লিনিকের লোকজনকে বল, ওটি যাতে রেডি থাকে।'

আমি ফোনটা কানে ধরে রবিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটি ঠিকঠাক আছে?'

ও জানালো, সব প্রস্তুত।

'পার্ফেক্ট!' বলে বাবলি রেখে দিল।

রোগীকে একটা ফ্লুইড দিয়ে ওটিতে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করলাম। আধা লিটার ফ্লুইড যাওয়ার আগেই বাবলি ওর দলবল সহ চলে এল। ওর ক্লিনিকের একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছে। সাথে একজন অ্যানেস্থেসিস্ট আর একজন সহকারী। অবাক হলাম যখন খেয়াল করলাম একজন নার্সও নিয়ে এসেছে। কিছুটা বিরক্তও হলাম, মফস্বলের ক্লিনিক বলে এখানকার নার্সদের উপরও ভরসা করা চলে না তা হতে পারে না।

রোগীর বোনের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিল, বলল যেহেতু টুইন বাচ্চা এবং একটোপিক, এটা বেশ দীর্ঘ অপারেশন হবে, সেটার প্রস্তুতি থাকতে হবে। ব্লাড ম্যানেজ করা ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম প্রয়োজন হলে আমিও ওটিতে অ্যাসিস্ট করবো।

কিন্তু বাবলি কিছুটা কর্তৃত্ব নিয়ে বলল, 'আসিফ আমি পুরো টিম নিয়ে এসেছি, অন্য কারো ওটিতে ঢোকার প্রয়োজন নেই।'

সামান্য মর্মাহত হলেও ব্যাপারটা হজম করে নিলাম। কারণ প্রকৃত অর্থে আমার ওটিতে থাকা অপ্রয়োজনীয়। আমি তিন্নির সাথে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, এ অবস্থায় মেয়েটাকে একা করিডোরে অপেক্ষারত রেখে বাসায় ফিরতে ইচ্ছা হল না।

তিন্নির হাতে ওর বোনের আগের কিছু ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট ছিল, সময় কাটাতে ওগুলোতে চোখ বোলানো শুরু করলাম। বার সপ্তাহের একটা আল্ট্রাসনোগ্রামের রিপোর্ট পেলাম, ফোর ডি আল্ট্রাসনো, ভাল একটা ডায়াগনস্টিক থেকে করানো। ওখানেও একটোপিক প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে বেশ খটকা লাগলো। এখানে খুব বড়সড় একটা ফাইন্ডিং আছে, যেটা বাবলির চোখে না পড়ার কথা না। কিন্তু ও সেদিন এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি।

আমি যেটা সন্দেহ করছি সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এর পরের কোনো রিপোর্ট দেখা লাগবে। কিন্তু কাগজ ঘেঁটে দেখলাম ফোরডি আল্ট্রাসনো ওরা আর করায় নি। নরমাল রিপোর্টগুলো দেখলাম, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বোঝা যায় না, তারপরও ফিল্মগুলো দেখে আমার সন্দেহ আরো পাকাপোক্ত হল।

ভাবলাম ব্যাপারটা বাবলির সাথে শেয়ার করা যাক, একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে যে হয়তো ও ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

ওটি রুমে ঢোকার জন্য থিয়েটারের দরজায় ধাক্কা দিতে খেয়াল করলাম দরজা ভেতর থেকে লাগানো। বেশ অবাক করা ব্যাপার। ওটির দরজা বন্ধ করার কেন প্রয়োজন হল তা মাথায় এল না। আমি নক করে বললাম, বাবলি আল্ট্রাসনোতে বেশ বড় একটা ফাইন্ডিং আছে।

ভিতর থেকে বাবলি সেটা শুনে সাথে সাথেই জবাব দিল, আসিফ, এ ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলি।

শুনে বেশ অপ্রস্তুত হলাম। কারণ, মনে হল ও কিছু লুকাতে চাচ্ছে, কিন্তু কেন?

আশংকাটা সত্যি হল তিন্নির সাথে আলাপে। তিন্নির থেকে আমি রোগীর হিস্ট্রি নেয়া শুরু করলাম, মেডিসিনে যেটা দস্তুর। ঠিকঠাক হিস্ট্রি নিতে পারলে সেটা ডায়াগনসিসে যতটা সাহায্য করে, অগুনতি ল্যাবটেস্ট করেও সেটা হয় না। বাবলি আমাকে যেমনটা বলেছিল যে মেয়েটার স্বামী অজ্ঞাত, প্রভাবশালী পরিবার এসব কোনটাই জানলাম সত্যি নয়। তিন্নি জানালো ওর বোনের স্বামী কয়েকমাস আগে ভয়াবহ এক রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। স্বামীর সাথে সিলেট শহরে মীরাবাজারে ওরা থাকতো, দুর্ঘটনার পর তিন্নি চলে আসে বোনকে সঙ্গ দিতে। আমি বেশ অবাক হলাম, কারণ বাবলি পুরো ঘটনাটা অন্যভাবে আমাকে বলেছে। এর কারণ কি হতে পারে সেটাও মাথায় আসছিলো না।

আমি আমার বিস্ময়টা যথা সম্ভব চেপে তিন্নির সাথে আলাপ চালিয়ে যাই।

'আপনার বোনের স্বামীর পরিবারের লোকজন কই?'

'আমার বোনকে দেখভাল করার মত কেউ নেই, ওর হাজবেন্ডের পরিবারে আছে শুধু বয়স্ক বাপ-মা, তারা পুত্রশোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া দুজনার কেউই ছোটাছুটি করা বা হাসপাতালে আসার মত ফিট না।

এমন সময় ওটির ভিতর থেকে বিকট একটা চিৎকার ভেসে আসলো। তিন্নির বোনের গলা।

আমরা দৌড়ে গিয়ে ওটির দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, আগের মতই ভিতর থেকে বন্ধ। আমি দরজায় আঘাত করে বললাম, 'বাবলি কী সমস্যা? চিৎকার কেনো?'

ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ বের হল না।

আমার মনে হল কোনো একটা অশুভ ব্যাপার ঘটছে। তিন্নি দেখলাম কেমন থরথর করে কাঁপছে, ভয় পেয়েছে। দ্বিতীয় বার রোগীর চিৎকার শুনলাম-মনে হচ্ছে ভয়ার্ত গলা, যন্ত্রনা হলে এভাবে কেউ চিৎকার করে না। রুমে কী হচ্ছে যে রোগী ভয় পাচ্ছে?

রবিকে ডেকে বললাম দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করতে। একটা খালি অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল করিডোরে, সেটা ধরে ও নিয়ে আসে। তারপর দুইজন মিলে সেটা নিয়ে দরজার উপর আঘাত করি। সাথে সাথে বাবলির গলা শোনা যায়, আসিফ আমরা ঠিক আছি, একটু পরেই দরজা খুলছি।

বাবলি কি ইচ্ছা করেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল, যখন দেখছে দরজা ভাঙছি তখন সাড়া দিচ্ছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে দারুণ ক্ষোভ হল, আমি রবিকে বললাম, 'রবি থামার দরকার নেই। হাত চালা।'

তৃতীয় আঘাতেই দরজার চুরমার হয়ে গেল।

আমরা দরজার ভাঙা পাল্লা সরিয়ে ঢুকে যাই। ঢুকে ভিতরের দৃশ্য দেখে কিছুটা জমে যাই। আমরা ঢুকে পড়ায় ওরা একপাশে জড়ো হয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখলাম ওটি প্রায় শেষ, ওরা অ্যাবডোমেন ক্লোজ করেছে, রোগী পুরোপুরি অচেতন। পাশের ট্রেতে দুটো বাচ্চা। একটা বাচ্চা স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য বাচ্চাটার মুখের জায়গায় বেশ বড় একটা গহ্বর, চোখ নাক কিছু নেই। গহ্বরে ছোট ছোট অনেকগুলো সূচালো দাঁতের মত। একটা চাপা শব্দ বের হচ্ছে সে গহ্বর থেকে, খাঁচায় আটকানো ইঁদুরের শব্দের সাথে সেটার মিল রয়েছে, আর হাত পা ছুড়ছে স্বাভাবিক বাচ্চার মত। এমন বীভৎস দৃশ্য আমি আমর জীবনে দেখি নি।

বাবলি অপরাধী গলায় বলল, 'আসিফ কাম ডাউন। এই একটা বাচ্চা অন্যরকম বলেই আমরা কাউকে ওটিতে ঢুকতে দিচ্ছিলাম না। রোগী এবং অন্য বাচ্চা ভাল আছে।'

তিন্নি জ্ঞান হারিয়ে পাশে পড়ে গেল যখন দৃশ্যটা দেখলো। রবি ওকে ধরে মেঝের একপাশে বসে পড়লো।

আমি বললাম, 'আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে এটা বোঝা গিয়েছিল একটা একটোপিক বাচ্চার পাসেন্ট ডেভেলপ করেনি। তারমানে ওটা নিউট্রিশন নিচ্ছিলো অন্যভাবে।'

বাবলি তাতে সায় জানালো। 'হ্যাঁ প্যারাসাইটের মত ও সরাসরি ব্লাড থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছিলো।'

সেটা কীভাবে নিচ্ছে তা বুঝতে আর বাকি থাকে না। ওটা মানব শিশু বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে কোনো একটা উৎস খুঁজছে খাবারের। ওটা অন্য বাচ্চাটা থেকে আকৃতিতে কিছুটা বড়, আন্দাজ করলাম দুইকেজির বেশি ওজন হবে, অন্য দিকে স্বাভাবিক বাচ্চাটা টেনেটুনে দেড়-কেজি হতে পারে, নাও পারে। বাচ্চাটাকে এখনই ইনকিউবেটরে না ঢোকালে মারা পড়বে।

আমি বললাম, 'তারমানে এটা মায়ের অ্যাবডোমেনের কোনো একটা স্থান থেকে সরাসরি ব্লাড চুষে নিত?'

তার জবাবে বাবলি আমাকে ট্রেতে আঙুল দিয়ে দেখালো।

যদিও আরও ভয়ংকর কিছু দেখবো সে আশা করিনি। একদিনের জন্য যথেষ্ট অস্বাভাবি ব্যাপার দেখে ফেলেছি। তারপরও যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম।

দেখলাম প্যারাসাইটের মত মুখ বিশিষ্ট বাচ্চাটা অন্য বাচ্চাটার পেটে মুখ লাগিয়ে আছে, যেমনটা জোঁক আমাদের চামড়ায় লেগে থাকে। বুঝতে বাকি রইলো না, ও পুষ্টি বা রক্ত চুষে নিচ্ছে ওর সহোদর থেকে। বাচ্চাটার পেটে নানা জায়গায় ছোট ছোট ক্ষত চিহ্ন।

আমি দ্রুত বাচ্চাটাকে ধরে আলাদা করে দিলাম। তাতে বাবলি আক্রমনাত্মক ভাবে বাঁধা দিতে আসলো।

'আসিফ আমাদের এই মিরাকল বেবির সারভাইভালের জন্য দ্বিতীয় বাচ্চাটাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। প্রথম কয়েকদিন এই বাচ্চা থেকেই ওর পুষ্টি নিতে হবে, সাধারণ চামড়ায় ও মুখ লাগিয়ে পুষ্টি নিতে পারবে না।'

ওর কথাটা আমার কান দিয়ে ঢুকলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হল।

কী ভয়ংকর কথা বলছে ও! এটা নিয়ে ওর পরিকল্পনা কী?

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। রবিও মারমুখি হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বললাম, এক্ষুনি তোমরা এই ক্লিনিক থেকে বের হয়ে যাও।

বাবলি আমাদের মারমুখি রূপ দেখে মনে হল একটু ভড়কালো। বলল, 'আসিফ বোঝার চেষ্টা কর। এই ট্রান্সফরমেশন মেডিকেলের বিরাট একটা

ঘটনা। এই প্যারাসাইটের মত বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য এক দুইটা শিশুর জীবন কিছুই না।'

রবি ততক্ষণে একটা ফ্লুইড ঝোলানোর স্টান্ড হাতে নিয়েছে।

আমি আবার দৃঢ়স্বরে বললাম, 'বাচ্চাগুলোর ব্যাপারে ওর ফ্যামেলি ডিসিশন নিবে। তোমরা এক্ষুনি বেড়িয়ে যাবে।'

তারপরে বাবলি যা করলো তা দারুণ অপ্রত্যাশিত।

পরজীবী মুখের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে প্রায় দৌড়ে রুমে থেকে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে ওর পিছু নিল অ্যানেস্থেসিস্ট, লোকটা বের হওয়ার আগে রবিকে ধাক্কা মেরে একপাশে ফেলে দিল। এটা এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে আমি বা রবি কেউ বাধা দেওয়ার সুযোগও পেলাম না। আমরা যতক্ষণে ক্লিনিকের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি ততক্ষনে ওরা গাড়িতে উঠে পড়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও ওর নিজের ব্যক্তিগত গাড়িটাও নীচে ছিল, নিজেরাই ড্রাইভ করে পালিয়ে গেল।

ওর সাথের নার্স, আর সহকারীকে প্রথমে আমরা আটকে রাখলেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। কারণ বাবলির অবাধ্য হবার সুযোগ ওদের ছিল না আর ওরা পুরো ব্যাপারটা জানতোও না।

অন্য বাচ্চাটাকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। দ্রুত আমরা বাচ্চাটাকে এনআইসিউতে পাঠিয়ে দেই। তিন্নির জ্ঞান ফেরার পরও বহুক্ষণ অপ্রকৃতিস্থের মত ছিল। ওর বোনের জ্ঞান ফেরার পর স্বভাবতই আমরা পুরো ঘটনাটা বললাম না। মেয়েটা জানলো ওর একটা বাচ্চাকে বাঁচানো গেছে।

***

এরপর আমি বাবলির খোঁজে সিলেটে গিয়েছিলাম, পাইনি। চেম্বার বন্ধ করে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে শুনলাম। পরিচিত কারো কাছ থেকেই কোনো খোঁজ পাইনি। অ্যানেস্থেসিস্টের নাম না জানায় খুঁজে খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না।

বাবলির সাথে এরপরে দেখা হয় প্রায় মাস ছয়েক পরে। এয়ারপোর্টের ডমেস্টিক লাউঞ্জে। একটা জরুরি কাজে আমি সিলেট থেকে ঢাকা যাচ্ছিলাম, লাউঞ্জের এক কোনায় ওকে আবিষ্কার করলাম। নিজেকে যথাসম্ভব কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে, মুখে মাস্ক। বাবলি কিনা সেটা নিশ্চিত হতে কাছে যাই। আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো।

আমি ওর সামনে গিয়ে বসলাম মুখোমুখি।

আমি কিছু বলার আগেই বলল, 'স্যরি, তোর সাথে আর যোগাযোগ করিনি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাচ্চাটার কী অবস্থা? বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ ও ভাল আছে।'

'কই আছে?'

'আমার সাথেই আছে।'

'তোর সাথেই আছে!'

'হ্যাঁ, আর ভাল আছে। বড় হচ্ছে।'

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'কেন এই কাজটা করলি?'

বাবলি কিছুক্ষণ থেমে বলল, 'এই বাচ্চাটা ওর পরিবার এমনিতেই মেরে ফেলতো, আমি সরিয়ে এনেছি বলে বাঁচানো গেছে!'

'ওর ফিডিং কীভাবে হচ্ছে?'

'এটা একটা চ্যালেঞ্জ, তবে একটা ব্যবস্থা করেছি।'

'কী ব্যবস্থা?'

'আসিফ, আমি সেটা তোকে বলতে চাচ্ছি না!'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমার ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছিলো।

ওঠার আগে খেয়াল করলাম, ওর হাতে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট লালচে ক্ষত। হাতদুটো বেশ বিবর্ণও।

আর হাতের পাশাপাশি ফেস মাস্কের বাইরে যতটুকু মুখ দেখা যাচ্ছে সেটাও ভীষণ ফ্যাকাশে, আর অ্যানেমিক!


ফাঙ্গাল

ক'দিন হল ছাতক এসেছি। জায়গাটা সিলেট থেকে বেশি দূরে নয়, সমস্যা একটাই শহর থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশ খারাপ। অবশ্য এটা আমার জন্য বড় সমস্যা সেটা বলা সমীচিন হবে না, আমি শহরে যাব মাসে দুই থেকে তিনবার, তাই পুষিয়ে যাবে।

জায়গাটা বেশ সুন্দর সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। চেম্বার থেকে কিছু দূরেই একটা নদী, নদীর ওপাড়ে ছবির মত টিলার সারি। পাড় থেকে তলার পাথর পর্যন্ত দেখা যায়, যাকে বলে কাকচক্ষু জল। বিকেলবেলা একদিন হেঁটে এসে বেশ মুগ্ধ হয়েছি। মানুষজনও বেশ কম রাস্তাঘাটে। আমার জন্য এটাও ভাল ব্যাপার।

তারিকের প্ররোচনায় এখানে আসা। তারিকের এখানে জমজমাট চেম্বার ছিল, এই তল্লাটে এমবিবিএস ডাক্তার ও একজনই ছিল। এমবিবিএসের চাহিদা এখানে খুব বেশি ব্যাপার সেটা নয়, তবে এইখানে নানা কারণে কিছু বাইরের মানুষ এসে বসবাস করে। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির লোক, নানা এনজিওর কর্মচারি ইত্যাদির কাছে ওর চেম্বারটা একটা ভরসা ছিল। তারিকের মতে প্রথমদিকে স্থানীয়রা খুব একটা না এলেও ইদানিং ওর চেম্বারে তাদের আনাগোনাও কম নয়। গত বছর আমি একদিন ঘুরতে এসে সেটার প্রমাণও পেয়েছিলাম। তারিকের আর এটা ধরে রাখার উপায় ছিল না, ইংল্যান্ডের একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হয়ে গেছে, ট্রপিকাল ডিজিজ নিয়ে মাস্টার্স কোর্সে, বছর দুয়েক পরে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে আবার দেশে ফেরার-তাই চেম্বারটা হাতছাড়া হয়ে যাক সেটা ও চাচ্ছিলো না। আমি রেসাল্টের পর বসে ছিলাম জানতো, তাই আমাকেই পাকড়াও করলো চেম্বারটা চালিয়ে নিতে।

আপত্তি করার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। একে তারিক আমার গুটিকয়েক কাছের বন্ধুদের একজন, তার উপর এমন একটা চেম্বারের সুযোগ আমার জন্য মন্দ না। টাকা পয়সার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেটা নয়, তবে ওটা এমন বস্তু যার আগমন কখনোই অনাকাঙ্খিত নয়।

আমি আসার আগেই তারিক পাততাড়ি গুটিয়ে সটকে পড়েছে। চেম্বারের চাবিটা পকেটে নিয়ে আমি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ওখানে গিয়ে হাজির হই। গতবছর এসেছিলাম বলে পথ-ঘাট চিনতে সমস্যা হল

না। চেম্বারের সাথেই থাকার ব্যবস্থা, একটা একতলা দালান-খোলামেলা। বাড়িঅলা সিলেট শহরে থাকেন, আগে হয়তো এ বাড়িতেই থাকতেন। রান্না আর ছোটখাট কাজ করার জন্য এক বুড়ো বাবুর্চি আছে, হাসমত মিয়া। লোকটার যা বয়েস, তাতে খুব একটা ভরসা পেলাম না তাকে দিয়ে রান্না করাতে, অন্য কাজতো দূরের কথা। চামড়া ঝুলে পড়েছে মুখ থেকে, দাড়ি গোঁফ নেই, কিন্তু পুরু পাকা মোটা ভুরু তার কিছুটা পুষিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু প্রথম দিনের খাবারে বুড়োর ব্যাপারে ধারণা বেমালুম বদলে গেল, এতো দেখি দ্রৌপদির হাত নিয়ে জন্মেছে। হাসমত মিয়া আমার মুখ দেখে অনুমান করলো রান্না আমার পছন্দ হয়েছে।

'বুড়ো হয়েছি বাপজান, জুয়ান বয়সের হাত নাই, অত সোয়াদ পাবেন না। কিন্তু তরি তরকারি খুব তাজা, কিছু তো আমার নিজের ক্ষেতের। মাছটা কুশিয়ারার। ওতে স্বাদ কিছুটা পুষিয়ে যাবে।'

আমি তাতে জিব কামড়ে বললাম, 'কী যে বলেন চাচা, এমন স্বাদ তো পুরা সিলেটের কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আপনার ভাষায় তো মনে হচ্ছে না সিলেটের আদমি। কোথায় ছিলেন?'

বুড়ো জানাল, তার মূল বাড়ি নরসিংদী, এইখানে ভাগ্যের ফেরে এসে আটকে পড়েছেন। এক সাহেবের সাথে এসেছিলেন এখানে, সাহেব সিমেন্ট কারখানার তদারকি করতো। সে চলে যাওয়ার পর এখন এখানেই আছেন, আদীনিবাসে ফেরার কোনো তাড়া নেই।

অন্তত খাবারের ঝামেলা হবে না সেটা নিশ্চিত হওয়া গেল। খাওয়া শেষে একটু জায়গাটা কেমন তা দেখতে বের হলাম। খুব ছোট একটা শহর, ঘন্টাখানেক পা চালিয়ে হাঁটলেই এমাথা থেকে ওমাথা ঘোরা হয়ে যায়। একটা জমিদার বাড়ি আছে দেখলাম জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, পরিত্যক্ত। ঘাসলতাপাতায় মাখামাখি হয়ে অর্ধেকটা ঢেকে আছে। এখানে যতটুকু ব্যস্ততা তার বেশিরভাগ সিমেন্ট কারখানার লোকেদের। শহরের যতটুকু নাগরিক ভাব তা হয়েছে তাদের কল্যানেই। হাঁটতে হাঁটতে একটা ঝিরি পথে এসে পড়েছিলাম। জঙলা পথ ধরে আরো একটু এগুবো কিনা এমন একটা সংশয়ে ছিলাম। ঠিক তখন একটা লোক পেছন থেকে এসে আমাকে ডাক দিল।

'ডাক্তার সাহেব!'

একটু চমকে উঠলাম, দেখলাম একটা মধ্যবয়স্ক লোক। বেশ রোগা, চোখগুলোতে তীক্ষ্ণতা নেই, কিছুটা কালশিটে পড়া। পোশাক আশাক

ধোপদুরস্ত, মনে হচ্ছে এখানে কোথাও বড় চাকরি করেন। কথা শুনেও বুঝলাম সিলেটি কথা খুব ভাল হচ্ছে না।

'কিছু মনে করবেন না, আপনি বোধহয় তারিক সাহেবের চেম্বারে বসবেন?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি কীভাবে বুঝলেন আমি তার বদলে এসেছি?'

তিনি তাতে মনে হল বিব্রত হলেন। অবশ্য আমি চাচ্ছিলাম তিনি বিব্রত হোক, এভাবে পিছনে পিছনে এসে হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করা কিছুটা অদ্ভুত আচরণ তো বটেই।

'না, ছোট্ট শহর তো, কে এল কে গেল এসব আর জানতে কতক্ষণ?'

এড়িয়ে যাব চিন্তা করছিলাম। সামলে নিলাম পরক্ষণে, এই নির্জন জায়গায় সঙ্গী পেয়েছি সেটাও ভাল একটা ব্যাপার। তাই হেসে বললাম, 'আমি তো আজকেই এলাম, পথঘাট চিনছি। কতদূর গেছে এই ঝিরি পথ?'

'এটা সামনে এক টিলাতে শেষ হয়েছে, আরো ধরুন মিনিট দশেক হাঁটার পর। আপনি বুঝি ঘুরতে ভালবাসেন?'

'খুব ভালবাসি তা না, বলতে পারেন সাধারণ কৌতূহল। বিকেলের দিকে একটু না হাঁটলে শরীরটা ভারী ঠেকে।'

'যা বলেছেন, আমারো তাই।'

'ওহো, আপনার পরিচয় জানা হয়নি?'

'আমি সারওয়ার, এখানে আছি গত চার বছর ধরে। কাজ করছি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।'

'সিমেন্ট কারখানা?'

উনি হেসে ফেললেন। 'না না, সিমেন্ট ছাড়াও অন্য ব্যবসা বাণিজ্য এখানে আছে।'

আমি এবার কিছুটা বিব্রত হলাম। 'আসলে আসার পর বেশ কয়েকজনের সাথে পরিচয় হল, সবাই দেখলাম ওই কারখানার।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি, আমি আসলে এখানে একটা হিমাগারের দায়িত্বে আছি। আমাদের কোম্পানি মৌসুমি ফল, কয়েকধরনের শস্য সংরক্ষণ করে। দেশের অনেক জায়গাতেই আমাদের হিমাগার আছে।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!'

ভদ্রলোকের সাথে কথা আর বেশিদূর এগুলো না। সন্ধ্যে হয়ে আসছিলো বলে আমি ফিরতি পথ ধরলাম। তিনি অন্য আরেক রাস্তা ধরে তার বাড়ির

পথ ধরলেন। যে রাস্তা ধরে গেলেন সেটাকে রাস্তা বলাটা ঠিক হবে না, জঙ্গলের মধ্যে বলতে গেলে মিলিয়ে গেলেন।

আমার মনে হল সারোয়ার সাহেবের কোনো একটা ঝামেলা আছে। মূলত কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা বা দাঁড়ানো ইত্যাদিতে। বেশ নার্ভাসও মনে হল। আবার এই সন্ধ্যার সময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেল এটাও ঠিক স্বাভাবিক ঠেকলো না। একটা খচখচানি মনে রয়ে গেল, দেখি হাসমত মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে হবে!

২.

প্রথম ক'দিন তেমন কোনো রোগী হল না। চেম্বারটা মাসখানেক বন্ধ ছিল। এটা যে এখন চালু হয়েছে সেটা জানতে লোকজনের স্বভাবতই কিছুটা সময় লেগে গেল। এর মধ্যে কোনো কোন রোগী এসে আগের ডাক্তার না পেয়ে হতাশ হল, সেটা মুখে না বললেও তাদের চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল। তবে আমি জানতাম কিছুদিন পর এটা জমা শুরু করবে। কারণ আমার মত সময় নিয়ে ভাল করে রোগী খুব কম ডাক্তারই দেখে, বিশেষত এমন এলাকায়। রোগী দেখার কাজটা আমাকে আনন্দ দেয় এটা একটা কারণ। এই আনন্দ যার আছে তার চেম্বার আজ হোক কাল হোক জমবেই। আর আমার পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কেউ যদি ধরা ফি না দিতে চায় বা কম দিতে চায় সেটা আমি হাসিমুখে মেনে নেই।

হাসমত মিয়া এদিক দিয়ে আরেককাঠি সরেস। সে প্রথম দুইদিন আমার রোগী দেখা দেখে কী বুঝেছে কে জানে, তারপর সে আমার সুনাম প্রচারে নিজেকে প্রবল উদ্যমে নিয়োজিত করেছে। রোগী দেখার সময় সে আশেপাশেই থাকে, বের হওয়ার সময় নানা জ্ঞান দেয়। আমার কানে আসে বলছে, 'তুমি মিয়া যেমন ভাবে চলো, এইভাবে বেশিদিন চললে বাচতাইন না। তোমার কপাল বালা যে এলাকায় এমুন ডাক্তার পাইছো, ঠিকঠাক ঔষধ খাইবা।'

মাসখানেকের মধ্যে রোগীর চাপ বেশ বেড়ে গেল। সন্ধ্যে পার হয়ে যাওয়া শুরু করলো রোগী দেখতে দেখতে। কিছু কলেও যাওয়া শুরু করলাম। এমন এক কলে গিয়ে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীনও হয়েছি সেটা খানিক পর বলছি।

মাঝখানে একদিন সিলেটে গেলাম এক কাজে। কিছু কেনাকাটা ছিল। এখান থেকে সকাল বিকাল দুটো বাস যায় সিলেটে। ফেরার বাসটা বিকাল

চারটার মধ্যে ছাতক পৌঁছে যায়। সেদিন কোনো কারণে দেরি হল, প্রায় ছয়টা বেজে গেল। ঘরে ফিরতে হাসমত মিয়া আমাকে পাকড়াও করলো, বললো কয়েকজন রোগী বসে আছে অনেকক্ষণ।

আমি ভেবেছিলাম আজকে আর রোগী দেখবো না, কিন্তু বসে থাকলে ফিরিয়ে দেয়ার মানে নেই। আমি ফ্রেশ হয়ে চেম্বারে চলে গেলাম। সবমিলিয়ে দশ-বারোজন রোগী। সাধারণ জ্বর সর্দি কাশির রোগীই বেশি। তারিকের কিছু পুরনো রোগী এখন আসা শুরু করেছে। ক্রনিক রোগের রোগী। রেগুলার চেক-আপের জন্য আসে। দেখতে দেখতে কখন যে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে খেয়াল করিনি। সব গুছিয়ে উঠতে যাব এমন সময় এক পরিচিত মুখের আগমন ঘটলো।

সরোয়ার সাহেব! আমি সহাস্যে চেয়ারে বসতে বললাম। লোকটা বেশ কাঁচুমাচু মুখ করে ঢুকলেন।

বললেন, 'আমি একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, তবে সমস্যাটা আমার না। আমার মেয়ের।'

'নিয়ে আসলেন না কেন?'

'আসলে ও ওর মার সাথে ঢাকা থাকে।'

ওখানে তো অনেক ডাক্তার..?

'হ্যাঁ, আমি ডাক্তারের কাছে যেতে বলি, ওখানে তো কত বড় বড় ডাক্তার। কিন্তু ওরা যেতেই চায় না। আমি ঢাকা গিয়ে ওর সাথে যাব তবে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা বলুন কী সমস্যা। যতটুকু পারা যায় শুনে চিকিৎসা দিয়ে দেই।'

উনি একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'মেয়েটার সারা শরীরে স্কিন ডিজিজ হচ্ছে। যেখানে হচ্ছে সেখানে কালচে হয়ে যাচ্ছে।'

আমি একটু হতাশ হয়ে বললাম, 'স্কিন ডিজিজ তো না দেখে বোঝা খুবই মুস্কিল। অ্যালার্জির সমস্যা না ফাঙগাল ইনফেকশন তা আলাদা করা কঠিন, রোগী সামনে না থাকলে।'

'আমার কাছে একটা ছবি আছে, দেখাবো?'

আমি হাল ছেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ দেখান। দেখে যদি বুঝতে পারি।'

তিনি তার পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা ছবি আমাকে দেখালেন।

দেখে আমি একটু ভড়কালাম। ছবিটা খুব স্পষ্ট বলা যাবে না, পেটের ছবি। চামড়ায় একটা কালচে আস্তরণ পড়ে গেছে। চামড়ার নীচে রক্ত জমে থাকলে যেমনটা হয় তেমন। ভাল মত দেখে মনে হল ফাঙগাল ইনফেকশন। গ্রোথ দেখা যাচ্ছে, ম্যাকুলোপ্যাপুলার র‍্যাসের মত, অর্থাৎ কোথাও কোথাও চামড়াটা ফুলে আছে।

আমি চিন্তিত মুখে বললাম, 'অলরেডি দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ভাল কোনো স্কিন স্পেশালিস্ট দেখান। এভাবে ছবি দেখে ট্রিটমেন্ট দেয়া ঠিক হবে না।'

উনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'দেখুন, আমি বুঝতে পারছি আপনি কোনো রিস্ক নিতে চাচ্ছেন না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি একটু অনুমান করে চিকিৎসা দিয়ে দিন। কাজ না করলে আপনাকে দোষারোপ করার মত মানুষ আমি নই। ওরা আসলে আমি না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ডাক্তার দেখাবে না। আর আমার কোম্পানির ঝামেলার কারণে অন্তত দু'সপ্তাহ যেতে পারছি না। মানে আপনি এমন ওষুধ তো দিতে পারেন যেটাতে অন্তত অবস্থা আরো খারাপ হবে না?'

লোকটার কথায় আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম। হ্যাঁ, চাইলে এমন একটা ক্রিম দেয়া যায়, ফাঙগাল ইনফেকশনের কথা চিন্তা করে, যেটা দেব সেটাতে কাজ না করলেও অবস্থার অবনতি হবে না সেটা মোটামুটি নিশ্চত। আমি তাই রাজি হয়ে প্রেসক্রিপশনে কিছু ঔষধ লিখে দেই।

সারোয়ার সাহেব তাতে কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন। ভিজিট ফি বাড়িয়েও দিতে চাইলেন। আমি হেসে তা মানা করলাম, রোগী না দেখে ঔষধ লিখেছি তাতে ফি আরো কম নেয়া উচিত সেটা বললাম। উনি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে উঠে পড়লেন, আবারও ধন্যবাদ দিয়ে।

আর রোগী ছিল না। হাসমত আলী আজ মাটন দিয়ে কিছু একটা করবে বলেছে, তাই দেরি না করে চেম্বার বন্ধ করে পা চালালাম।

৩.

আজ একটা কলে গিয়েছিলাম। কলে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব সম্ভবত শহরে আর নেই, তবে এসব দূর-দূরান্তে যেখানে সময় কিছুটা পিছিয়ে আছে সেখানে এই অনুরোধে অবাক হওয়া যায় না। রোগী এক বয়স্ক নারী, তার

ছেলে এসে অনুরোধ করলো যাতে দেখে আসি। সবে চেম্বারে এসে বসেছি এমন সময়ের ঘটনা।

গতকাল রাত থেকে বেশ বৃষ্টির উৎপাত, সকালের দিকে একটু ধরে আসলেও আকাশটা কালচে হয়ে আছে। রোগী ছিল না, খুব সহসা হবে বলেও মনে হল না। তাই আমি একটা ছোট ব্যাগে স্টেথো, বিপি মেশিন আর কয়েকজাতের ঔষধ নিয়ে রওনা হয়ে যাই ভদ্রলোকের সাথে, ওনার সাথে করে নিয়ে আসা গাড়িতে করেই। ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল যেতে যেতে। নাম আলমগির। এলাকায় তাকে সবাই একনামে চেনে সেটা নিজেই বলল। চেনার মূল কারণ তার বাপ এখানকার চেয়ারম্যান ছিল দীর্ঘদিন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আলমগির সাহেবের বয়স পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের ঘরে। পান খাওয়া মুখ, গলায় সোনার চেইন, হাতে রংবেরঙের আংটি। উনি বৃদ্ধার ছোট ছেলে। পেশায় ব্যবসায়ী। পাথর আর বালুর কারবার। মা'র শরীর খারাপে কিছুটা বিচলিত।

সেদিন বিকালে বের হয়ে একটা সৌখিন বাড়ি দেখেছিলাম, গেট দিয়ে ঢোকার পর বুঝলাম এটা ওনাদের বাড়ি। বেশ যত্ন করে বানানো, উঁচু সিড়ি, গোলাকার পিলার উঠে গেছে ফটকের দু'পাশ দিয়ে, তাতে বড় পাতার মানি প্লান্ট গাছ। হলরুম পেরিয়ে বৃদ্ধার শোবার ঘরে গিয়ে পৌছাই। পুরনো আমলের আসবাবপত্র, পান-সুপারি, মসলা আর অচেনা গন্ধে মনে হল গত শতাব্দীর কোনো জমিদার বাড়ির কোনো ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছি। বৃদ্ধার বয়স নব্বইয়ের উপরে। মুখের অসংখ্য ভাঁজের মধ্য থেকে দুটি নিষ্প্রভ চোখ জানান দিচ্ছে জগৎ নিয়ে তার আগ্রহ শেষ হয়েছে। নাড়ি ধরে বলার আগেই বুঝলাম মারা গেছেন কিছু আগে। বৃদ্ধার বিছানার পাশে দাঁড়ানো ও বসা পরিবারের মানুষজনও সেটা টের পেয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কারো কারো যতটুকু বিভ্রান্তি ছিল তা আমি ঘুচিয়ে দিলাম খানিকক্ষণ পরীক্ষা নীরিক্ষা করে।

কেউ খুব বেশি বিচলিত হল বলে মন হল না। বড় ছেলে শুধু চোখ মুছলো।

ওরা গাড়িতে করেই আবার আমাকে ফেরত দিয়ে আসতে চেয়েছিল। আমি সে সুযোগ দিলাম না। বললাম, আমাকে নিয়ে এসময় ভাববেন না দয়া করে।

অবশ্য তাতে আমার একটা ঝামেলাতে পড়তে হবে জানি। এই বৃষ্টিতে কী করে ফিরবো সেই দুর্ভাবনা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। কিছুটা ভিজতে হল, তবে রিকশা পেয়ে গেলাম।

বৃষ্টি ভালোই হয়েছে। রাস্তাঘাটে পানি জমে গেছে। ভিজেই যেহেতু গেছি মাঝখানে বাজারে নেমে কিছু মাছ কিনলাম। একদম টাটকা নদীর মাছ। হাসমত মিয়া পেয়ে খুব খুশি হবে।

রুমে ফিরে গা হাতপা মুছে ফ্রেশ হয়ে বসতেই ফোন বেজে উঠলো। আলমগির সাহেবের ফোন। কী ব্যাপার জানতে চাইলে বললেন, লাশটাকে আজই কবর দেয়া যাবে না। তার বোন মৃত্যু সংবাদ শুনে ইংল্যান্ড থেকে রওনা হবেন আজ। দেশে পৌছাবেন পরশু রাতে। ততক্ষণ পর্যন্ত লাশটা রাখার জন্য কী করা যায় সে ব্যাপারে জানতে চাইলেন।

আমি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি বলে ফোনটা রাখলাম। ফরেনসিকে আছে এমন এক পরিচিত জুনিয়রকে ফোন দিলাম। ও জানালো ঢাকা নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঢাকায় কিছু প্রাইভেট মর্গ আছে যেখানে লাশ রেখে দেয়া যাবে চার পাঁচদিন পর্যন্ত।

আলমগির সাহেবকে সেটা জানানোর পর উনি মনে হল হতাশ হলেন। সিলেটে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই তাতে যারপরনাই বিরক্ত। তার ঝামেলাটা আমি উপলব্ধি করলাম, মায়ের লাশ নিয়ে এত টানা হেচরা করা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার না।

সারাদিন রোগী আর তেমন হল না। হাসমত মিয়া নতুন কেনা মাছগুলো দিয়ে বেশ খোলতাই স্বাদের একটা মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সাথে করে নিয়ে আসা সতীনাথ ভাদুরির একটা উপন্যাস পড়ছিলাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে। একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। লাগোয়া বারান্দায় টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ ঘুমকে ত্বরান্বিত করেছে।

হাসমত মিয়ার ডাকে ঘুম ভাঙলো। বললো, আলমগির সাহেব আবার এসেছেন গাড়ি নিয়ে। আমি একটু চমকালাম। উনি আবার কী কারণে আসতে পারেন ভেবে পেলাম না। আর কেউ অসুস্থ হলো?

ভদ্রলোক চেম্বারের বাইরের বারান্দায় বসে ছিলেন। আমি চোখে মুখে পানি দিয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। সামনে বসার পর বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি সম্ভবত। আমার সাথে আরেকবার আসতে হবে।'

'আর কেউ কি অসুস্থ...?'

'না না! আসলে মায়ের লাশটার একটা ব্যবস্থা করেছি। করতে একটু ঝামেলা করতে হল। আপনাকে একটু নিয়ে দেখাতে চাই ঠিক আছে কিনা।'

'ব্যবস্থা করেছেন?' আমি একটু অবাক হলাম। 'এখানে?'

'হ্যাঁ, ছাতকে একটা কোম্পানির হিমাগার আছে। ওখানে ওরা খাবার দাবার রাখে, দুই নাম্বারি ব্যবসা আরকি। কমদামে কিনে বেশি দামে বেচার বিজনেস। ওখানে লাশটা রাখবো ভাবছি।'

'হিমাগারে? ওরা রাজি হল?'

আলমগির সাহেবের মুখে একটু বাঁকা হাসি ফুটলো। 'এই এলাকায় ব্যবসা করতেছে, আমার প্রয়োজনে রাজি না হয়ে যাবে কই? প্রথমে একটু গাইগুই করছিলো কিন্তু না করার সাহস পায়নি।'

আমি বললাম, 'আমি কী করতে পারি?'

'আপনি এসে একটু দেখবেন, লাশ রাখার টেম্পেরেচারটা ঠিক আছে কিনা।'

প্রথমে ভেবেছিলাম না করে দেই, আমি এই ব্যাপারে উপযুক্ত টেকনিক্যাল পারসন না সেটা বলি। কিন্তু বুঝতে পারলাম সেটা করলে ব্যাপারটা অমানবিক হয় এবং তারচেয়েও বড় কথা আমার তো কিঞ্চিত জ্ঞান আছে কত তাপমাত্রায় লাশ রাখা যায়, যা হয়তো এখানে আর কারো নেই, সুতারাং যেতে আপত্তি করার কিছু নেই।

আলমগির সাহেবের গাড়িতে করে হিমাগারে পৌঁছালাম। জায়গাটা বাজার পেরিয়ে কিছুটা সামনে। আশেপাশে অন্যকোনো বড় ভবন নেই। বাইরে থেকে জানালাবিহীন প্রায় দো'তলা সমান উঁচু ভবনটা দেখে কেমন অস্বস্তি হল। মনে মনে ধারণা করছিলাম, সেদিন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে দেখা হয়েছিল ওই ভদ্রলোকের হিমাগারটাই কিনা, গিয়ে সেটা নিশ্চিত হলাম। সারোয়ার সাহেব আমাদের অপেক্ষাতেই ছিলেন মনে হল। গাড়ি হিমাগারের সামনে থামতেই তিনি কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। উনি ছাড়া আর কেউ আছে বলে মনে হল না। অবশ্য সময়টা অফিস টাইমের পরে, হয়তো এজন্য কেউ নেই।

ভিতরে ঢুকে দেখলাম বড় একটা করিডোর। দু'পাশে জাহাজের কন্টেইনারের মত ছোট ছোট রুম।

সারোয়ার সাহেব ট্যুর গাইডের মত আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন কোনটা কী।

'এই কন্টেইনারের মত জিনিসগুলো হল ওয়াক ইন কুলার। মানে ভিতরে মানুষ ঢুকতে পারে এমন রেফ্রিজারেটর আর কি। এসবে আমরা নানা ধরনের খাবার রাখি সংরক্ষণের জন্য।'

দেখলাম সব মিলিয়ে প্রায় ছয়টা ওয়াক ইন কুলার আছে ভবনটাতে। আলমগির সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের দুইদিনের মত লাশটা রাখতে হবে। কোথায় রাখবেন সেটা দেখান।'

প্রশ্নটাতে সারোয়ার সাহেব বিব্রত হলেন সেটা মুখ দেখেই বোঝা গেল। ব্যাপারটা স্বভাবতই তার পছন্দ হচ্ছে না। তিনি কণ্ঠস্বর একটু খাদে নামিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গেলে আমার চাকরি থাকবে না।' কথাটা শুনে আলমগির সাহেবের চোখ মনে হল জ্বলে উঠলো, 'আপনার কি মনে হয় আমি শখ করে এমন খারাপ জায়গায় আমার মায়ের বডি রাখতে?'

সারোয়ার সাহেব ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'অবশ্যই না। আমি আপনার বিপদটা বুঝতে পেরেছি।'

'আর শোনেন, এটা জানাজানি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গাড়িতে করে লাশটা এখানে পৌঁছাবে অন্ধকার থাকতে, গাড়িতে করেই ফেরত আনা হবে। বাড়ির লোকরাও সবাই জানবে না লাশ কই রাখা হচ্ছে।'

সারোয়ার সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের রুমের শেষের দিকে রাখা একটা ওয়াক ইন কুলারের কাছে নিয়ে এলেন। দরজাটা চাবি দিয়ে খুলতে দেখলাম ভেতরে ছোট একটা রুমের মত। ওটাতে আলমগির সাহেব ঢুকতে চাইলেন না, আমি আর সারোয়ার ঢুকে পড়লাম। একটা তীব্র কনকনে শীত সাথে সাথে অনুভব করলাম। সারোয়ার বললেন, 'এখন তাপমাত্রা শূন্য এর কাছাকাছি আছে। এটা ম্যাক্সিমাম পাঁচ ছয় ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে।'

'কী রাখা ছিল এখানে?'

'অল্প কিছু ফুড আইটেম রাখা ছিল, দেশি আলু। আপনারা আসার আগে আমি সেগুলো সরিয়ে অন্য একটাতে রেখেছি।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না; তবে কিছু একটা ঠিক মিলছে না, এটা স্পষ্ট। বললাম, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে, তাপমাত্রা ঠিক আছে।'

বের হয়ে আলমগির সাহেবকেও জানালাম। শুনে উনি আশ্বস্ত হলেন। ফোনে কাউকে নির্দেশনা দিলেন ডেডবডিটা যাতে নিয়ে আসা হয়।

ডেডবডির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সারোয়ার সাহেবের সাথে আলাপ হচ্ছিলো একপাশে বসে।

'আপনার মেয়ের স্কিন ডিজিজের কী অবস্থা?'

'এখনো কোনো উন্নতি হচ্ছে না, আপনার দেয়া ক্রিমটা লাগাচ্ছে গত তিনদিন ধরে।'

'দুইদিনে কিছু বোঝা যাবে না, এক সপ্তাহ ক্রিমটা লাগানোর পর বুঝতে পারবেন।'

'তা ঠিক!'

'আপনি তো গত সপ্তাহে এসেছিলেন, এতদিন পর চিকিৎসা শুরু করেছে?'

'আসলে আপনার ঔষধগুলো পাচ্ছিলাম না, পরে একদিন সিলেট শহরে গিয়ে একটা বড় ফার্মেসিতে পেলাম!'

আমি কিছুটা অবাক হলাম, 'কিন্তু এসব ঔষধ তো ঢাকাতে খুব সহজে পাওয়া যায়। আপনি ওদের ওখান থেকে কিনে নিতে বলতে পারতেন!'

উনি মনে হল কিছুটা বিব্রত হলেন, 'আসলে আর বলবেন না, ওর মা আমি ঢাকা না যাওয়ায় রাগ করে আছে। নিজে গিয়ে ঔষধ কিনে আনবে সেটাতেও সে রাজি না। আমি তাই বাধ্য হয়ে কিনে কুরিয়ার করেছি।'

আমি আর কিছু বললাম না, মনে মনে ভদ্রলোকের স্ত্রীর উপর বিরক্ত হলাম। রাগ করে সন্তানের ঔষধ কিনছে না এটা কেমন কথা!

আধা ঘন্টার মধ্যে আলমগির সাহেবের মায়ের ডেডবডি চলে এল। তার ছোটভাই এসেছে, সাথে বাড়ির একজন পুরনো চাকর। একটা কাঠের কফিনের মত জায়গায় ডেডবডিটা রাখা। সেটা সবাই মিলে ধরে আমরা ওয়াক ইন কুলারে নিয়ে রাখলাম। কুলারের একপাশে কিছু তাকের মত থাকলেও কফিন রাখার জন্য সেটা যথেষ্ট জায়গা সম্পন্ন না। তাই মেঝেতেই রাখা হল কফিন। কফিনের উপরের পাটাতনটা খুলে রাখতে হবে সারোয়ার জানালেন, না হলে লাশ ভাল থাকবে না। পাটাতন খুলতেই ভদ্রমহিলার মৃতমুখ উন্মোচিত হল। বুঝতে পারলাম মৃতদেহকে গোসল দেয়া হয়েছে। কাফনের কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা সারা দেহ। মুখটা শুধু খোলা। দেখে আমার বেশ অস্বস্তি হল। দরজা বন্ধ করার সময় মনে হল জ্যান্ত কাউকে আমরা কুলারের তীব্র ঠাণ্ডায় বন্দি করে রাখলাম।

কাজ শেষে আমরা সারোয়ার সাহেবের অফিস কক্ষে বসলাম কিছুক্ষণ। এটা হলরুমের গেটের ঠিক পাশেই। প্রতিটা কুলারের তাপমাত্রা এ রুম থেকে মনিটর করা যায় দেখলাম, প্রতিটাতেই তাপমাত্রা চার থেকে পাঁচ ডিগ্রীর মধ্যে আছে।

ওঠার আগে আলমগির সাহেব সারোয়ারকে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'না না, এটা আমি নিতে পারবো না!' সারোয়ার সাহেব অস্বস্তি নিয়ে বললেন।

'ধরে নেন আমি আপনার কুলারটা ভাড়া নিলাম কয়েকদিনের জন্য, ঢাকা পাঠালে তো খরচ হতোই।'

সারোয়ার সাহেব আর বিশেষ আপত্তি করলেন না।

টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন।

৪.

একটা জরুরি প্রয়োজনে হঠাৎ আমার বাড়ি যেতে হয়। বাবা কোনো এক বিয়ের অনুষ্ঠানের কাচ্চি খেয়ে পেট নামিয়ে ফেলেছে। এসব খাবার তার নিষেধ স্বভাবতই, তাই পেট খারাপের কথা প্রথমে বলেনি কাউকে। যখন বলল ততক্ষণে হাসপাতালে না ভর্তি করলে নয়। ফোনে ব্যাপারটা জানামাত্র আমি রওনা হয়ে গেলাম। কলেরা হাসপাতালে তিনদিন পার করার পর তার অবস্থার আস্তে আস্তে কিছুটা উন্নতি হল।

এই ঝামেলা সামাল দিয়ে আমি ছাতক ফিরলাম ঠিক আটদিন পর। হাসমত মিয়া ভেবেছিল আমি বোধহয় আর ফিরবো না। বুঝলাম বুড়ো আমাকে ফিরতে দেখে বেশ খুশি। বেশি কথা না বাড়িয়ে বাজারে চলে গেল। আজকের ভাল খাওয়ার আয়োজন হবে বুঝতে পারলাম।

পরদিন বিকালে হাঁটতে বেড়িয়ে আবার সেই ঝিড়ি পথে চলে গেলাম। জায়গাটার প্রতি আমার একটা টান তৈরি হয়েছে বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যার আগে ফিরতে যাব এমন সময় সারোয়ার সাহেবের সাথে দেখা। আমাকে দেখে উনি বেশ অবাক হলেন মনে হল। কাছে এসে বললেন, 'কই ছিলেন? আমি তো ভেবেছি আপনি বোধহয় চলেই গেছেন একেবারে।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'এই ভাবনাটা আরো অনেকে ভেবেছে, আপনি একা নন।'

সারোয়ার সাহেবের এই ক'দিনে মনে হল ওজন চার-পাঁচ কেজি কমেছে। হাঁটছেনও বেশ অস্থিরতা নিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আলমগির সাহেবের ব্যাপারটা ঠিকঠাক মিটেছে?'

মনে হল উনি এ প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলেন। নিজ থেকে প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন না। তবে যেটা বললেন তাতে আমিও চমকালাম। জানালেন লাশটা এখনো তার হিমাগারে পরে আছে। আলমগির সাহেবের বোন কী এক জটিলতার কারণে এখনো আসতে পারেননি। আসবেন আরো তিনদিন পর। উনি আসার পর লাশ বের করা হবে।

'ভাই, আলমগির সাহেবের জন্য আমার চাকরিটা চলে যাবে। যেকোনো দিন আমার কোম্পানির লোক চলে আসবে। উনি অন্য কোনো ব্যবস্থায় যাবেন না, আমার হিমাগারেই লাশটা রাখবেন।'

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। বুঝলাম দু'পক্ষই বেশ ঝামেলায় পড়েছে।

'জানাজানি হলে কী একটা কেলেঙ্কারি হবে, চিন্তা করেন ভাই!'

আমি তাতে সায় জানালাম। একবার কোনোভাবে এই খবর চাউর হলে কোম্পানি তার চাকরি রাখবে না সেটা জানা কথা, এমনকি কোম্পানিটাও উঠে যেতে পারে। তেমনটা হলে তারা সারোয়ারকে ছেড়ে দেবে না, আইনি ঝামেলায় পড়তে হবে বেচারাকে।

তবে দুইদিন পর ঝামেলাটার সুরাহা হল। আলমগির সাহেবের বোন চলে এলেন। লাশ হিমাগার থেকে বের করে দাফনের জন্য প্রস্তুত করা হল। বিকালের দিকে জানাজা পড়িয়ে দাফন করা হবে। আমার সেখানে থাকা দায়িত্ব মনে করে আমিও আলমগির সাহেবের পারিবারিক কবরস্থানে হাজির হলাম। সারোয়ার সাহেবও আছেন দেখলাম। তিনি যে বেশ স্বস্তি পেয়েছেন তা তার মুখ দেখে বুঝলাম।

কবরে নামানোর ঠিক আগে ভদ্রমহিলার মুখটা আবার নজরে পড়লো। হিমাগারে রাখা সত্ত্বেও মুখটা বেশ খানিকটা বিকৃত হয়ে গেছে। মুখটা শুকিয়ে কিছুটা যেন ছোট আর কালচে হয়ে গেছে। এক পলকের বেশি দেখার সাহস হল না। কাফনে মুড়িয়ে নামানো হল কবরে। মাটিচাপা দেয়ার পর আমারও মনে হল একটা আপদ বিদায় হয়েছে।

ওখান থেকে ফেরার সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ধরতে পারলাম। তাতে মনে একটা খচখচানি শুরু হল।

ততক্ষণে সন্ধ্যে নামছে। আমি ফেরার নাম করে একটু আড়ালে চলে এলাম। সারোয়ার সাহেবকে খুব সাবধানে ফলো করতে লাগলাম।

সারোয়ার সাহেব কবরস্থান থেকে বেড়িয়ে পায়ে হাঁটা একটা পথ ধরে ফেরা শুরু করলো। বুঝলাম ও নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে হিমাগারের

দিকে যাচ্ছে। আমার মন বলছিলো আমার ওকে অনুসরণ করাটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তবে কৌতূহল দমন করতে পারছিলাম না।

একটা মোড় ঘুরতেই লোকটা মিলিয়ে গেল। আমি একটু দ্বিধান্বিত হলাম। মূল রাস্তা থেকে কোথাও নেমে গেল। এখন হয়তো আর সামনে যাওয়াটা উচিত হবে না। তবে ঔচিত্যবোধ লোপ পেয়েছে বুঝলাম, আমি তারপরও দ্রুত পায়ে হেঁটে আরো কিছুদূর গেলাম। দিনের বেলা রাস্তাটা খুবই মনোরম, কিন্তু আলো কমে যাওয়ায় কিছুটা গা ছমছমে ভাব চলে এসেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম আরেকটু সামনে গিয়ে বাজারের দিকে চলে যাব। হিমাগারটা বাজার থেকে ডান দিকে, বামে মোড় নিয়ে ফিরে আসাটাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই কোথা থেকে যেন সরোয়ার সাহেব উদয় হলেন। আমি ভিতরে ভিতরে বেশ চমকালাম। উনি একগাল হেসে বললেন, 'আরে ডাক্তার সাহেব! আপনি এখানে? বাড়ি ফেরেননি।'

আমি ইতস্তত হেসে বললাম, 'এই একটু বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আপনি এখানে?'

'আর বলবেন না, কী একটা ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলাম দেখেন। বুড়ির লাশটা থাকায় আমি হিমাগারে ঢুকতেই সাহস পেতাম না। কোনোমতে দিনের বেলা টেম্পারেচারটা চেক করে চলে আসতাম। অনেক কাজ জমে আছে। আমি তাই ওদিকে যাচ্ছি।'

আমি হেসে বললাম, 'কাল সকালেই যেতে পারতেন।'

'উহু, খোদাতালা কী বাঁচা যে বাঁচিয়েছে। আগামীকালই কোম্পানির কিছু লোক আসবে। আজকে লাশটা খালাস করতে না পারলে আমার বারোটা বাজতো। কালকের ভিজিটের জন্যই কুলারটা একটু গোছাতে হবে। ওখানে কিছু মালামাল ভরে না রাখলে প্রশ্ন উঠবে।'

'আচ্ছা বুঝতে পেরেছি।'

'আসবেন নাকি, আপনি থাকলে একটু সঙ্গ পেতাম।'

'আপনার লোকগুলো নেই?'

'না এতোক্ষণ কী করে ওদের আটকে রাখি! নিজেই যতটুকু পারি করবো।'

আমার ইতস্তত ভাব দেখে পরে আবার বললেন, 'আপনি না চাইলে আসতে হবে না। এমন মনখারাপ করা জায়গায় আপনার যেতে মন চাবে না সেটাই স্বাভাবিক।'

আমি তাতে অস্বস্তি ঝেড়ে বললাম, 'না না, সমস্যা নেই। চলেন, ওখান থেকে বেড়িয়ে পরে বাজার করতে যাব।'

দ্বিতীয়বারের মত আমি হিমাগারে প্রবেশ করলাম। আমি অফিস রুমের একটা চেয়ারে বসলাম। সারোয়ার সাহেব বললেন, 'ঘড়ি ধরে বিশ মিনিট কাজ করবো আমি। আপনি এখানে বসুন।'

আমি বললাম, 'বসে থাকার প্রয়োজন নেই আমার। চলেন, আপনাকে সাহায্য করি।'

সেটা শুনে তিনি জিভ কাটলেন। 'মাফ করবেন, আপনাকে দিয়ে আমি মালামাল টানাতে পারবো না। ডাক্তার মানুষ আপনি।'

আমি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি শুনলেন না। আমাকে বসিয়েই ভিতরে চলে গেলেন।

আমি কিছুক্ষণ বসে খুব সন্তর্পনে উঠলাম। আমার যে ব্যাপারটা যাচাই করা দরকার তা করা যায় কিনা দেখা শুরু করলাম। করিডোরে একবার উঁকি দিলাম।

সারোয়ার সাহেব কাজে মগ্ন। এক ওয়াকইন কুলার থেকে অন্যটাতে কিছু বাক্স নিয়ে রাখছেন একটা ট্রলিতে করে। কিছুক্ষণ সাবধানে হিসাব করলাম, ট্রলিটা খালি করতে তার প্রায় চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগছে। এই ফাঁকে আমার বাকি কুলারগুলা একবার করে চেক করতে হবে। সারোয়ার সাহেব যে কুলার থেকে মালামাল নিয়ে রাখছেন এবং যেটাতে রাখছেন এগুলো বাদ। বাকি রইলো চারটা।

আমি গুটি গুটি পায়ে করিডোরের বাম পাশেরটাতে ঢুকে গেলাম। ভারী দরজা ঠেলে ঢুকতেই গায়ে বরফ শীতল বাতাস আঘাত করলো। মাঝারি আকৃতির একটি আবদ্ধ রুম। দেয়াল জুড়ে সারি সারি তাক, তাকে সাদাটে বাদামী বাক্স। দ্রুত চোখ বোলালাম, উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়লো না।

সাবধানে বেড়িয়ে গেলাম ওখান থেকে। পরেরটাতে ঢোকার আগে করিডোরের একটা পিলারে পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। সারোয়ার সাহেব এখনো বের হননি। আমি দ্রুত অপরপাশের কুলারে ঢুকে পড়লাম। এই কুলারটা বেশ বড়। তাকগুলো আলু পেয়াজ জাতীয় নানা কিছুতে পরিপূর্ণ। মিনিটখানেকের ভেতর বেড়িয়ে পড়লাম।

সারোয়ার সাহেব যাতে সন্দেহ না করে তাই এবার বের হয়ে আবার অফিস কক্ষে ফিরে এলাম। সেখান থেকে উঁকি মেরে করিডোরের দিকে

তাকিয়ে একবার গলা উঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী অবস্থা ভাই, কতদূর?'

'ভাই স্যরি, আর দশটা মিনিট সময় দিন।' একদম সামনের কুলারের ভেতর থেকে সারোয়ার সাহেব জবাব দিলেন।

আমি মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আবার অভিযানে নামলাম। এবার তিন নম্বর কুলারটা চেক করতে হবে। বিড়ালের মত গুটি গুটি পায়ে কিছুটা দেয়াল ঘেঁষে আমি কুলারটার কাছে পৌঁছে গেলাম। এটা বেশ ছোট মনে হল। ভিতরে ঢুকতে একটা আশটে গন্ধ নাকে আঘাত করলো। মাছ? হ্যাঁ মাছই হবে। তাকের কাছে গিয়ে দেখি বড় বড় শোলার বাক্স সাজানো। খুলে দেখলাম একটা, একসারি সাদা চকচকে ইলিশ বেড়িয়ে এল। হিমাগারে মাছ রাখছে দেখে বেশ অবাকই হলাম। আমার ধারণা ছিল শুধু ফল জাতীয় কিছু হয়তো রাখা।

রুমের একপাশে বড় আরেকটা শোলার বাক্সের ঢালা খুলতেই যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম। একটা কফিন আকৃতির বাক্স, তাতে এক ভদ্রমহিলা আর একটা শিশু শুয়ে আছে।

আলমগির সাহেবের মা'র মুখের র‍্যাশ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি এই একই র‍্যাশের ছবি আমি আগেও দেখেছি। সারোয়ার সাহেবের দেখানো ছবিগুলোতে। একই রকমের প্যাটার্নের র‍্যাশ, একটু কালচে অসংখ্য বিন্দুর মত, তার মাঝে শিকড়ের মত একটা অবয়ব।

সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী ও মেয়ে এখানেই আছে দীর্ঘদিন। তিনি কোনো এক অজানা কারণে ওদের লাশদুটো সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হয়তো খুন করে!

দৃশ্যটা দেখে নিশ্চয়ই আমি জমে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিলো হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। কোনো একটা ভুল হলে আমার অবস্থাও এই হিমাগারে থাকা লাশদুটোর মত হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। দ্রুত বেরিয়ে পড়া উচিত, কিন্তু আমি নড়তে পারছিলাম না।

সারোয়ার সাহেব তার স্ত্রী কন্যাকে এই হিমাগারে রাখলেও বেশ যত্নে রেখেছেন মনে হল। বেশ পরিপাটি পোশাক পড়ানো, চুল সুন্দর করে বাঁধা। খুব সম্ভবত মুখে মেকাপও করেছেন। তার স্ত্রী বেশ সুশ্রী, গ্রীক দেবীদের মত মুখের গড়ন। মনে হয় এক্ষুনি যেন চোখ খুলে তাকাবেন। মেয়েটাও পুতুলের মতই, চার কি পাঁচ হবে বয়েস। একটা হলুদ ফ্রক পড়ানো, মাথায় ঝুঁটি করা। মায়ের পাশে আরেকটি ছোট কাঠের বাক্সে রাখা মেয়েটির দেহ।

পিছনে একটা শব্দ হল। সারোয়ার সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে তিনি এসেছেন। তিনি কি জানতেন আমি গোয়েন্দাগিরি করছি?

৫.

অফিস রুমে আমি আর সারোয়ার সাহেব মুখোমুখি বসে আছি।

তিনি ক্রমাগত চোখ মুছছেন। তার সব অব্যক্ত কথা যেন একযোগে মুখ থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য মুখিয়ে আছে।

'ওরা কীভাবে মারা গেল?' আমি সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনমাস আগে ওরা ছাতকে আসে আমার সাথে। আমি এখানে চাকরি নিয়ে আসার পর অনেকদিন ওরা ঢাকাতে ছিল। এখানে ভাল একটা বাসা পেয়ে যাওয়ায় নিয়ে আসি।

আমার মেয়েটা আগামী বছর স্কুলে ভর্তি হতো। ভেবেছিলাম তখন ওদের সিলেটে পাঠিয়ে দেব। বছর খানেক আমার সাথেই থাকুক। জুলি, মানে আমার স্ত্রী এখানে আসতে রাজি হচ্ছিলো না। আমি কিছুটা জোর করেই এনেছি।'

'তারপর?'

'ওরা আসার সপ্তাহখানেক পর একদিন বাসায় ফিরে দেখি ওরা দু'জনাই মেঝেতে পড়ে আছে। ইলেকট্রিকের একটা নষ্ট সুইচ ছিল বাসায়, ওটাতে খুব সম্ভবত আমার মেয়ে হাত দিয়েছিল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে জুলিও ইলেকট্রিক শক খায়।'

'দুজনেই মারা গেছিলো?'

'জ্বী!'

'তারপর আপনি লাশদুটো আর দাফন করলেন না?'

'না আমি পারিনি। আমি কীভাবে ওদের মাটির নিচে পুঁতে রেখে আসবো?'

'হিমাগারে রেখে দিলেন?' আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

'জ্বি'

'কতদিন রাখবেন?'

'আজীবন। আমি ওদের ছাড়া থাকতে পারবো না।'

'কিন্তু ওরা তো মৃত।'

'হোক মৃত, আমার কাছে মনে হয় ওরা ঘুমিয়ে আছে।'

রেখেছেন যেন মনে হয় ওরা ঘুমিয়ে আছে।'

'আমার মেয়ে যদি আজীবন ঘুমিয়েও থাকে তাও ভাল, ওর দেহ আমি মাটির নীচে কেন পুঁতে ফেলবো!'

আমি কিছু বললাম না আর। সারোয়ার সাহেবের পয়েন্টটা আমি বুঝতে পারছিলাম। প্রিয় স্ত্রী কন্যাকে দাফন করার চেয়ে অন্যকোনো ভাবে যদি ঘুম পাড়িয়ে রাখার মত করে রাখা যায় সেটা হয়তো অনেকেই করতে চাইবে।

'আপনি কি আমাকে পুলিশে দেবেন?'

আমি প্রশ্নে অবাক হলাম। 'কেন?'

'জানি না, এটা তো বেআইনি হওয়ার কথা। মানুষ মারা গেলে লাশের দাবি আর নিকটজনদের থাকে না। পুরো সোসাইটি মৃতদেহদের মালিক হয়ে যায়।'

কথাটার সত্যতায় আমি মৃদু হাসলাম। বললাম, 'ভয় নেই। আমি ঠিক এই সোসাইটির অনুগত মানুষ নই। আপনার স্ত্রী কন্যাকে আমি আপনার থেকে কেড়ে নেব না।'

কথাটায় তিনি স্বস্তি পেলেন বোঝা গেল। বললেন, 'আমি হিমাগারে আর বেশিদিন ওদের আর রাখবো না। আমি বাসায় একটা ব্যবস্থা করছি। তখন ওরা আমার আরো কাছাকাছি থাকতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই, ওটা করতে পারলে তো খুবই ভাল হয়।'

খানিকবাদে আমরা বেড়িয়ে গেলাম। বাজারের রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে বাসার দিকে চলে আসলাম। বিদায় নেয়ার আগে সারোয়ার সাহেব বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি আমার যে উপকার করলেন তা আমি কখনো ভুলবো না।'

আমি বললাম, 'অয়েনমেন্টটা কাজ করেছে এজন্য বলছেন?'

তিনি হেসে বললেন, 'সেটা তো বটেই। তাছাড়া আমার নিজেকে এতদিন অস্বাভাবিক মানুষ মনে হত। আপনি যে আমার কাজটাকে সাপোর্ট করলেন সে কারণে কৃতজ্ঞ।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে মুচকি হেসে বিদায় নিলাম।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরই আমি ছাতক থেকে চলে আসি। আসার আগে সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী কন্যার স্কিনের ফাংগাল ইনফেকশন নিয়ে আরো কিছুটা গবেষণা করে নতুন কিছু ঔষধ আনিয়ে দিলাম। তাতে আরো ভাল কাজ হল। তবে ওই মৃতদেহদের মুখোমুখি আমি আর হইনি।

৬.

এরপর প্রায় দুই বছর কেটে গেছে। আমি ঢাকায় একটা ছোট ক্লিনিকে ডিউটি করি। একদিন সন্ধ্যায় একটা বাসস্টপে সারোয়ার সাহেবের সাথে দেখা হল।

তিনি আমাকে দেখে ছাড়লেন না। আমাকে রাতে খাওয়াবেন তার জোর অনুরোধ করলেন। বললেন, কাছেই একটা বাসায় তিনি গত বছর ধরে থাকেন। বাসস্টপে আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রবল বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। বৃষ্টিটা একটু ধরে আসতে তার সাথে রওনা দিয়ে দিলাম। প্রচণ্ড ক্ষুধার্তও ছিলাম। তাছাড়া খুব আগ্রহ হচ্ছিলো তার স্ত্রী কন্যার কী অবস্থা সেটা জানার জন্য। কিন্তু চট করে তো জিজ্ঞেস করা যায় না, মনে মনে ঠিক করে রাখলাম খাওয়া দাওয়ার পর একফাঁকে প্রসঙ্গটা তুলবো।

একটা তেতলা বাড়ির দুইতলায় তার বাসা। বেশ সাজানো গোছানো একটা ফ্লাট। বাড়িতে অন্য কেউ আছে বলে মনে হল না।

খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ভাল ছিল। বৃষ্টির দিনে খাওয়ার মত ডিস ছিল, খিচুড়ি ইলিশ মাছ, ধোঁয়া ওঠা ভুনা মাংস। বেশ আরাম করেই খেলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষে বেশ অস্বস্তি নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্ত্রী কন্যা কি এখনো আপনার কাছেই?'

তিনি হেসে বললেন, 'জ্বি!'

'আর বিয়ে করেননি?'

তিনি জিভ কেটে বললেন, 'আমি যে জীবন বেছে নিয়েছি তাতে কি নতুন কারো সাথে সম্পর্ক করা সম্ভব? কেউ কি মেনে নেবে?'

আমি সায় জানালাম। না, কেউ মানবে না।

তিনি বললেন, 'রান্না কিন্তু আমি নিজেই করেছি, কেমন হল?'

'হ্যাঁ, খুবই ভাল। আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই এমন রান্না করতেন?'

'হ্যাঁ, ওর থেকেই শেখা। আমি তো দূরের নানা জায়গায় থাকতাম, ও কিছুদিনের জন্য এসে এসে আমাকে রান্না শিখিয়ে যেত। ওর মত ভাল হয়নি, তবে অন্তত সিক্সটি পার্সেন্ট হয় আমার বিশ্বাস।'

উঠতে যাব এমন সময় বললেন, 'আপনি তো ছাতকে ওদের কখনো আর দেখতে চাননি। আজকে দেখে যান, নতুন ব্যবস্থাটা আপনার ভাল লাগবে।'

আমি মনে মনে চাইছিলাম দেখতে, কিন্তু এটা বলতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো। তাই সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

সারোয়ার সাহেবকে অনুসরণ করে ভিতরের একটা বেডরুমের মত জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। এই রুমটাই কুলার সেটা বুঝলাম। বাইরের দরজাটা স্টিলের, একটা মৃদু গুঞ্জন ভিতরে।

দরজাটা খুলতেই একপশলা ঠান্ডা হাওয়া প্রায় ভিজিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে রুমটায় প্রবেশ করে চমকে উঠলাম। রুমটা সারোয়ার সাহেব একটা সাধারণ রুমের মত করেই সাজিয়েছেন। একটা বেড, তারপাশে টেবিল ল্যাম্প, ড্রেসিং টেবিল। সুন্দর পর্দা দিয়ে দেয়াল ঘেরা। প্রচণ্ড ঠান্ডায় কোথাও কোথাও বরফ জমে আছে। তবে বিছানার চাদর আর পর্দা সাদা হওয়ায় সেটা খুব একটা চোখে লাগছে না।

বেডে শুয়ে আছেন তার সুশ্রী স্ত্রী জুলি, এতদিনেও তার মুখটা ভারি মনকাড়া, একটা হালকা রঙের শাড়ি তার পরনে। তারপাশে তার পাঁচবছর বয়সি মেয়েটা, মাকে যেন জড়িয়ে শুয়ে আছে। ওর পরনে নীলচে সাদা একটা ফ্রক। এবং ওদের পাশে আরেকজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা, মোটাসোটা, মাথায় কাপড় টানা, একটা সবুজ শাড়ি পড়ে শুয়ে আছেন।

আমি বয়স্ক ভদ্রমহিলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সারোয়ার সাহেবের দিকে সপ্রশ্নক দৃষ্টিতে তাকালাম।

সারোয়ার সাহেব মিনমিন করে বললেন, 'আমার আম্মা! গত বছর স্ট্রোক করে মারা যান।'



ঊয্যানোমামিয়ান

বছর খানেক আগের কথা।

তখন আমি ঢাকার এক ক্লিনিকে ডিউটি করি।

সিলেট থেকে চলে এসে কিছুদিন হয়েছে, পোস্টগ্রাজুয়েশনের পড়া পড়বো চিন্তা করেছিলাম। পড়তে মন বসছিলো না, কোথাও যে ট্রেনিং করবো সেই উদ্দীপনাও পাচ্ছিলাম না। খিলখেতে এক ক্লিনিকের ডিউটি করছিলাম, যা রোজগার হয় সেটা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো মোটামুটি। ক্লিনিকটা বেশি পুরনো না, তবে বেশ জমে উঠেছিল। ক্লিনিক মালিক একজন প্রবাসী ডাক্তার, প্রচুর অর্থ ঢেলেছেন রোগী টানতে। আমাকে রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার হিসেবে পেয়ে খুব খুশি।

একদিন ক্লিনিকের ইমার্জেন্সিতে বসে ছিলাম। এমন সময় দুটো মেয়ে আসলো। প্রথম দেখাতেই বলে দেয়া যায় এরা যমজ বোন। হুবহু একই রকম চেহারা। তবে এদের মধ্যে একজন রোগী, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছে। অন্যজন ধরে নিয়ে এসেছে। পেটের কাছে একটা কাপড় চেপে ধরা। কাপড়ে কালচে রক্ত মনে হল।

কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে জানালো, রান্না করতে গিয়ে ইনজুরড হয়েছে। কিচেন নাইফ ঢুকে গেছে পেটে।

মানুষ উদ্ভট ধরনের অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে আসে। তাই খুব বেশি অবাক হলাম না। দ্রুত ইমার্জেন্সির বেডে রেখে ইনজুরি কতটা মারাত্মক তা দেখলাম। তলপেটে লেগেছে। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, ছুড়ি বেশি গভীরে ঢোকেনি। চামড়ার স্তর পর্যন্ত কেটে গেছে, তার নীচে আর যায় নি।

আমি বললাম, 'ইনজুরি মারাত্মক না। তবে স্টিচ লাগবে আর বিপদ না কাটা অব্দি ভর্তি থাকতে হবে।'

সাথে আসা বোন হাফ ছেড়ে বাঁচলো মনে হল।

সার্জারি ইউনিটে রাখার ব্যবস্থা করলাম।

রোগীর নাম লিলি। বয়স ২৫।

ঠিকানা জিজ্ঞেস করে লিখতে গিয়ে খেয়াল করলাম, আমি যে এলাকায় থাকি ওরা সেখানকারই।

'কাছেই থাকেন?'

'হ্যা'

'আপনারা তো যমজ, রাইট?'

'হুম'

'আপনার নাম?'

'আমি পদ্ম।'

'ইন্টারেস্টিং। আমি ভেবেছিলাম লিলির সাথে মিলিয়ে কিছু হবে, মিলি বা বেলি।'

মনে হল এই প্রশ্নও আগেও অনেকবার করেছে অনেকে। উত্তর রেডিই ছিল।

'মিল আছে তো, দুটোই একই ধরনের ফুল।'

'ওহ, স্যরি। তাইতো।'

ওটিতে নিয়ে স্টিচ দিয়ে ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করে দেয়া হলো। বোনটা বেশ ঘাবড়ে গেছে। ওয়ার্ডে দেয়ার পর রাতে আরেকবার নীচে এসে আমার সাথে দেখা করলো।

'কী অবস্থা পদ্ম? সব ঠিকঠাক।'

'জ্বি, আপনাকে থ্যাংকস। স্যরি আগে থ্যাংকস দেয়া হয়নি।'

'না না, আপনি এখন বিপদে রয়েছেন। এ সময় সৌজন্যতা বাহুল্য।'

'তারপরও। যেভাবে ব্লিডিং হচ্ছিলো। আরেকটু হলে...'

'রাইট। ইনজুরি মারাত্মক না। কিন্তু ব্লিডিং হয়ে শকে চলে যেতে পারতো। তবে ক্ষতস্থানে ভাল মত চেপে ধরে এনেছেন এটা কাজে দিয়েছে।'

'আমার এক মেডিকেলের বন্ধু ফোনে বলল এভাবে নিয়ে যেতে।'

'ভাল পরামর্শ দিয়েছে। কিছু মনে করবেন না, ইনজুরিটা দেখে সেল্ফ হার্ম মনে হচ্ছে, আপনি নিশ্চিত এটা অ্যাকসিডেন্ট?'

'আমাকে তাই বলেছে। আমি বাসায় ছিলাম না, ভাগ্য ভাল সময় মত ফিরেছি।'

'হ্যাঁ, আরো দেরি হলে তো শকে চলে যেত। বাসায় আর কেউ ছিল না?'

'না, আমরা দু'বোনই ওই বাসায় থাকি।'

'পড়াশোনার জন্য?'

'হ্যাঁ, হোস্টেলে থাকা সম্ভব না। আমি হোস্টেল পেলেও ও পেত না, তাই এভাবে থাকছি।'

জানলাম মেয়েটি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে কাছের এক ভার্সিটিতে, বোনটি অন্য একটি কলেজে। একজন অনার্স সেকেন্ড ইয়ার অন্যজন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। শুনে আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা যমজ তো?'

'হ্যাঁ, আসলে ও পড়াশোনায় একটু গ্যাপ দিয়েছে।'

'আচ্ছা। বেশ বড় গ্যাপ পড়ে গেছে!'

পদ্ম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মনে হচ্ছে একটু ইতস্তত করছিলো।

আমি বুঝতে পেরে হেসে বললাম, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। অপ্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম। আসলে আমার পরিচিত কিছু যমজ ছেলে মেয়ে আছে। ওরা সাধারণত পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ প্রায় সবকিছুতেই এত কাছাকাছি দেখেছি তাই একটু অবাক হয়েছি।'

পদ্ম দুর্বল ভাবে হেসে বলল, 'হ্যাঁ সেটা ঠিকই বলেছেন। লিলি আর আমি এমনই ছিলাম। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমাদের সবকিছুই একই রকম ছিল। আমরা ক্লাস রেসাল্টেও একদুই মার্ক ব্যবধানে থাকতাম। একই ভাবে দু'জনেই পড়াশোনা করতাম, তাই সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। ক্লাস সেভেনে ওঠার আগে সেসময় গ্রামের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে।

আমরা সমবয়েসি কাজিনদের সাথে একসাথে ঘুরতাম। বাবা মা আর আমাদের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ পেত না বা দরকার মনে করতো না। একদিন ওদের সাথে আমরা দু'বোনই পুকুর পাড়ে গেছি। পুকুরটা বেশ বড়, আর চারপাশ জুড়ে গাছপালা। আমার কাজিনরা যারা ওখানে নিয়মিত যেত ওরা পাড় ঘেঁষে থাকা একেকটা গাছে উঠে লাফ দিয়ে পুকুরের পানিতে গিয়ে পড়তো।

আমি আর লিলি ওদের পাল্লায় পড়ে ভয়ে ভয়ে একটা জারুল গাছের ডালে গিয়ে উঠি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে ছিল না পুকুরে লাফ দেয়ার। আমরা অল্প বিস্তর সাঁতার পারতাম, কিন্তু উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটবো সে সাহস ছিল না।

হঠাৎ দেখলাম লিলি পা ফসকে নিচের পুকুরে পড়ে গেল। পড়েই যেন একটা পাথরের টুকরোর মত পুকুরের গভীরে চলে গেল।

আমি চিৎকার করায় সবাই মিলে ডুব সাঁতার কেটে ওকে খুঁজতে লাগলো। প্রায় চার-পাঁচ মিনিট পর ওর দেহটা আমাদের এক কাজিন টেনে উঠায়। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় মরেই গেছে। ওরা জানতো কী করতে হবে, পিঠ চাপড়ে পানি বের করা হয়, ও নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করে কিন্তু ওর জ্ঞান পুরোপুরি ফেরে না। দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ওখানেও জ্ঞান ফেরে না। পরে ঢাকার এক হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

ঢাকায় প্রায় তিন দিন পর ওর জ্ঞান ফেরে। কিন্তু ওর ব্রেনের নাকি বেশ ক্ষতি হয় ওই দুর্ঘটনায়। প্রায় বছর খানেক স্কুলে যেতে পারে না। পরে স্কুলে গেলেও পড়াশোনার সাথে ভাল তাল মেলাতে পারেনা।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়, তবে এখনো ওর কথা বলা বা মানসিক পরিপক্কতায় কিছুটা সমস্যা আছে।'

আমি শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। 'স্যরি, আপনার বোনের জীবনে এমন বাজে একটা ঘটনা ঘটেছিল।'

'না না, সমস্যা নেই। আপনি যেহেতু ওকে দেখছেন, আপনার জানা থাকলেই ভাল।'

পরদিন রাউন্ডে গিয়ে দুইবোনের সাথে আবার দেখা হয়। সাথে ওদের মা'কেও দেখতে পাই। ভদ্রমহিলা স্বভাবতই খুব ঘাবড়ে গেছেন।

আমি ওনাকে স্বান্তনা দিয়ে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। একদিন পরই বাড়ি চলে যেতে পারবে।'

উনি বললেন, 'দুই মেয়ে একলা একলা থাকে। এমনিতেই এটা নিয়ে চিন্তার শেষ নাই। তারপর এ ধরনের ঘটনা!'

কথা বলে বুঝলাম, ভদ্রমহিলা তার গ্রামের বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করেন তাই মেয়েদের সাথে থাকতে পারেন না। মেয়েদুটির বাবা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তারপর থেকে তাকেই সব দেখে শুনে রাখতে হয়, তাই মেয়েদের সাথে থাকতে পারেন না ইত্যাদি।

লিলির সাথে আগের দিন তেমন কথা হয়নি। আজকে 'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করাতে মাথা নেড়ে বুঝালো ভাল। আরো কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝলাম, মেয়েটি কথা বলার ভঙ্গিও পদ্ম থেকে আলাদা। একটু টেনে টেনে আস্তে আস্তে কথা বলে।

২.

কিছুদিন পর এই পরিবারটির সাথে আবারও দেখা হল। লিলিকে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল সময় মতই। কিন্তু সেলাইয়ের জায়গায় কোনো সমস্যা হচ্ছিলো। পদ্ম আমাকে ফোন দিয়ে বলে, ওর সেলাইয়ের জায়গাটা থেকে সামান্য ডিসচার্জ হচ্ছে আর ফুলে যাচ্ছে।

আমি ফোনে বললাম, আচ্ছা হাসপাতালে নিয়ে আসুন। দেখে দেই।

ওপাশ থেকে পদ্ম ইতস্তত গলায় বলল, লিলি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে না। আপনি কি একবার যেকোনো সময়ে এসে দেখে যেতে পারবেন?

এ ধরনের অনুরোধ বহুদিন পর পেলাম। আগে প্রত্যন্ত জায়গায় অনেকবার কলে গিয়েছি। কিন্তু ঢাকায় না।

আমি একটু দ্বিধায় ভুগে পরে রাজি হয়ে গেলাম, শর্ত দিলাম অবস্থা খারাপ হলে হাসপাতালে চলে আসতে হবে।

সেদিন বিকেলবেলা ওদের বাসায় গেলাম। আমি যে বিল্ডিংয়ে থাকি সেটা থেকে বেশ কাছে, জাস্ট একটা মোড় পরেই।

সেলাই এর জায়গাটা দেখে বুঝলাম, মারাত্মক কিছু না। তবে রেগুলার ড্রেসিং লাগবে কয়েকদিন। ড্রেসিং কীভাবে করতে হবে, কী কী লাগবে ইত্যাদি পদ্মকে বুঝিয়ে বললাম।

পদ্ম ভাল অ্যাপায়ন করালো। আমি কষ্ট করে এসেছি বলে নাস্তা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলো। এড়িয়ে যেতে পারলাম না। ও বেশ কিছু ডেজার্ট আইটেম তৈরি করেছে।

চা খেতে খেতে ওদের সাথে অনেক আলাপ হলো।

লিলিকে বললাম, 'তুমি যে এমন একটা অদ্ভূত ইনজুরি করেছো, এটা কীভাবে হল বলোতো?'

লিলি হেসে বলল, 'কিচেন নাইফটা হাত ফসকে এতদূর চলে যাবে ভাবিনি।'

'বাই এনি চান্স তুমি নিজে নিজে নিজের উপর কোনো অপারেশন করতে চাচ্ছিলে নাকি, ইতিহাসে এমন দুই একজন সার্জন আছে যারা নিজেই নিজেদের অপারেশন করেছে। একজন রাশিয়ান ডাক্তার অ্যান্টার্কটিকাতে একবার নিজের অ্যাপেনডিসেকটমি করে আয়নার সাহায্য নিয়ে। এই

কিছুদিন আগেই এক মেক্সিকান ভদ্রমহিলা তোমার ওই কিচেন নাইফের মত একটা নাইফ দিয়ে সিজারিয়ান অপারেশন করেছিল নিজের!'

'মাইগড! বেঁচে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, সে আর তার বাচ্চা দুইজনই ভাল আছেন এখনো।'

পদ্ম চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনি কি ওকে এখন আরো উৎসাহ দিচ্ছেন?'

'হাসপাতালের চাপ যদি কিছুটা কমানো যায় সেটা ভাল না!' আমি হেসে জবাব দিলাম।

কিছুদিন পরই লিলি পুরোপুরি সেরে ওঠে। এরপর রাস্তাঘাটে প্রায়ই এই বোনদ্বয়ের সাথে দেখা হত। লিলিকে সাধারণত সহজেই চেনা যেত, কলেজ ইউনিফর্মসহই দেখা হত অধিকাংশ সময়। আর পদ্মকে চেনা যেত ওর আত্মবিশ্বাসী হাঁটা আর চোখমুখের চাঞ্চল্য দেখে। একই পোশাকে থাকলে নিশ্চয়ই চিনতাম না, এত মিল চেহারায়!

এদের নিশ্চয়ই আগেও একই ভাবে দেখতাম, যেহেতু একই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আমরা আছি। দু'জনকে একসাথে খুব একটা দেখা যেত না বলে কখনো আলাদা করে খেয়াল করা হয়নি নিশ্চয়ই। হয়তো দু'বোনকে আলাদা আলাদা সময়ে দেখে একই মানুষ ভেবেছি।

ওদের সাথে দেখা হলেই কথা হত। খোঁজখবর নিতাম। ওরাও ছোটখাট অসুখ বিসুখে আমার চেম্বারে চলে আসতো।

ওদের এভাবে দেখে একটা ব্যাপার মনে পড়ে। ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠ হবো এমন অনেক মানুষ জনই আমরা রাস্তাঘাটে দেখি, কিন্তু তারা আমাদের কাছের মানুষ হবে সেটা এখনই জানি না বলে একে অপরের দিকে ভালোমত না তাকিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাই। এ ব্যাপারটা নিয়ে ব্লেক ক্রাউচ নামের একজন উপন্যাসিক একটা সায়েন্স ফিকশনও লিখেছিলেন, রিকারশন। একটি মেয়ে হঠাৎ করে তার কম বয়সের একটা সময়ে ফিরে যায়। তখন ও রাস্তাঘাটে এমন কিছু মানুষকে দেখতে পায় যাদের সাথে ও তখনও পরিচিত না, কিন্তু তারা ওর বেশি বয়সে খুব কাছের মানুষ। পথে ঘাটে দেখেও ওরা যখন মেয়েটিকে চিনতে পারে না তখন ও বেশ ধাক্কা খায়।

৩.

একদিন হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে বাসায় ফিরছি বিকেলবেলা।

রাস্তায় পদ্ম'র সাথে দেখা।

মুখ ভীষণ মলিন। দেখে মনে হল মারাত্মক কিছু হয়েছে।

আমি ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে পদ্ম?'

ও আমাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলো। প্রথমে কিছু বলতে চাচ্ছিলো না। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমি যেকোনো সময়ে পড়ে যাব। আমাকে কোথাও নিয়ে বসাবেন?'

পাশে একটা কফি শপ ছিল। আমি সাবধানে ওকে ধরে নিয়ে বসালাম।

কয়েকমিনিট ও কিছুই বলল না।

'পদ্ম, কী হয়েছে?'

'কিছু না!'

'কিছু তো হয়েছে, বলতে পারো। আর না বলতে চাইলে সেটাও সমস্যা না। কফি খাবে?'

'আপনি খান, আমি একটু বসি।'

'হট চকলেট?'

'উম, হ্যাঁ। সেটা খাওয়া যায়।'

আমি অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে দেখি টেবিলে মুখ গুঁজে পদ্ম কান্নাকাটি করছে। আমি বসতেই সেটা থামিয়ে দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'একটা ছেলের সাথে আমার প্রায় তিন বছরের সম্পর্ক। গত পরশু ও বিয়ে করেছে। আজকে ক্যাম্পাসে গিয়ে জানলাম।'

'মানে? তোমাকে না জানিয়ে?'

'হ্যাঁ, গত সপ্তাহেও আমরা একসাথে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না কী বলবো। পরে আস্তে করে বললাম,

'আমি খুবই দুঃখিত!'

ওকে বাসায় দিয়ে আসার পর কয়েকদিন নিয়মিত খোঁজ খবর নিলাম। মেয়েটি বেশ ভেঙে পড়েছে। বেশ কিছুদিন নিয়মিত প্যানিক অ্যাটাক হতো। সেটা হলে আমাকে ফোন দিত বা হাসপাতালে চলে আসতো।

মাসখানেক পরে ও বেশ ধাতস্থ হল। মনে হল আর কোনো সমস্যা নেই। হাসপাতালে চেকআপে আসার পর সেটা ওকে জানালাম।

আমার থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলল, 'আজকে আমার সাথে ডিনার করেন। আপনাকে আমি ট্রিট দিতে চাই।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী উপলক্ষে?'

'এই যে আপনি আমার পাশে ছিলেন এই বাজে সময়টাতে।'

আমি হেসে রাজি হয়ে গেলাম।

একটা ভাল রেস্তোরায় সেদিন দু'জন মিলে ডিনার করলাম। ডিনারে পদ্মকে অনেকদিন পর বেশ প্রাণোচ্ছল মনে হল। ডিনার শেষে রাস্তায় হাঁটতে নেমে ও চট করে বলল, 'আপনি আমার প্রেমিক হবেন?'

আমি একটু ভিড়মি খেলাম। বলে কি এই মেয়ে?

আমি একটু সতর্কভাবে বললাম, 'তুমি এখন যে স্টেজে আছো, এখনই নতুন কোনো সম্পর্কে জড়ানো ঠিক হবে না। তুমি একটা শূন্যতাবোধ থেকে হয়তো সেটা করতে চাইছ। আরেকটু সময় নিয়ে ভাবো।'

সেটার জবাবে পদ্ম আর বিশেষ কিছু বলল না, 'আচ্ছা, ভালো বলেছেন। ঠিক আছে, আমি সময় নেই!' বলে চুপ করে গেল।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমি একটা মজার গল্প বলা শুরু করলাম। হাসপাতালে এক রোগী কী অদ্ভুত আর কৌতুককর কাজ করেছে এ ধরনের একটা ঘটনা। সেটা শুনে মনে হল ও ইচ্ছে করেই বেশি বেশি হাসলো।

বিদায় নেয়ার আগে, আমাকে আরো একবার ধন্যবাদ জানালো।

'আপনি না থাকলে যে কী হতো, মরেও যেতে পারতাম।'

আমি হেসে ফেলি, 'পাগল, এমন মনে হয়! মানুষ কত কী সহ্য করে নেয়!'

'উহু, সত্যি সত্যি। আর আমার কিছু হলে লিলির কী হতো। ও এখনো আমার সাহায্য ছাড়া চলতে ফিরতে পারে না।'

আমি তাতে সায় জানাই।

এরপর পদ্মর সাথে আমার মাঝে মধ্যে ফোনে আলাপ হতো। কিংবা মেসেজে দীর্ঘ কথা হতো।

কয়েকমাসের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। আমরা মাঝে মধ্যেই এলাকার কোনো এক রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসতাম।

ও একটা চমৎকার মেয়ে সেটা বুঝতে পারলাম।

আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে জানালাম, ওকেও আমি পছন্দ করা শুরু করেছি।

পদ্ম এবার নিজে আরেকটু সময় চাইলো। আমাকে বলল, ও নতুন আরেকটা সম্পর্ক তখনই করবে যখন আগের সম্পর্ক থেকে পুরোপুরি বেড়োতে পারবে।

আমি সেটায় সম্মতি জানালাম। বললাম, 'তাই হওয়া উচিত।'

এই কথোপকথনের কয়েকদিন পর পদ্ম জানালো ও আমার সাথে আপাতত যোগাযোগ বন্ধ করে রাখতে চায়।

কারণ জিজ্ঞেস করাতে বলল, ওর নিজেকে বোঝার জন্য সেটা প্রয়োজন। ও আমাকে অনুরোধ করলো, যাতে ওকে ফোন বা টেক্সট মেসেজ না দেই, মানে পুরোপুরি যোগাযোগহীন কিছু সময় থাকতে চায়। প্রয়োজন হলে ও নিজেই যোগাযোগ করবে।

আমি বেশ অবাক হয়েছি কিন্তু রাজি হলাম।

আমার সন্দেহ হল ও হয়তো অন্য কারো প্রেমে পড়েছে। তাই আর ঘাঁটালাম না। রাস্তায় মাঝে মধ্যে দেখা হলেও কথা হত না, দূর থেকে হাত নেড়ে বিদায় নিত। লিলির সাথে দেখা হলে বরঞ্চ দুয়েকটা কথা হত, ওর কাছে যদিও পদ্মর ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হত না।

পদ্মর সাথে এভাবে পুরোপুরি যোগাযোগহীন হয়ে পড়লাম।

৪.

মাস তিনেক পরের ঘটনা।

হাসপাতালে বসে পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম। রোগীর চাপ কম। চা খেতে খেতে ভেতরের পাতায় একটা বিজ্ঞপ্তি দেখে চমকে উঠি। একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি।

> আমার বোন ফারজানা পদ্ম, ট্যুরে গিয়ে হারিয়ে গেছে। ওর উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, বয়স ২৩, গায়ের রঙ শ্যামলা, চুল পিঠ পর্যন্ত লম্বা। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওর খোঁজ দিতে পারলে আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিজ্ঞপ্তির সাথে পদ্মের একটা ছবি। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ছিলাম বিজ্ঞপ্তিটা।

পদ্ম হারিয়ে গেছে? অবিশ্বাস্য।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ডিউটি থেকে ফেরার পথে খোঁজ নিব।

কলিংবেল টিপতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, পদ্মকে পাওয়া গেছে কিনা সেটা জানতে এসেছি। পত্রিকার বিজ্ঞাপনের কথা বললাম। ভদ্রলোক মনে হল বিরক্ত হলেন। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই লিলি দরজায় এসে আমাকে ভিতরে বসতে বলল। লিলির চেহারার অবস্থা বেশ খারাপ। চোখ মুখ ফুলে আছে, সম্ভবত অতিরিক্ত কান্নাকাটি বা টেনশনে।

যে বয়স্ক ভদ্রলোক দরজা খুলেছে উনি লিলির মামা।

আমি বললাম, 'পুলিশকে জানানো হয়েছে?'

লিলি বলল, 'হ্যাঁ, থানায় জিডি করা হয়েছে।'

'কতদিন ধরে পদ্ম মিসিং?'

'এক সপ্তাহ!'

'বলো কি!'

ভিতরে ওর মাও ছিল। আমাকে দেখে চিনতে পারলেন।

ভদ্রমহিলাকে বেশ ধাতস্থ মনে হল, মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত না।

আমাকে বললেন, 'হারামজাদি পালাইছে! একটা বদ পোলার সাথে প্রেম করতো। ও পোলার সাথে কোথাও গেছে!'

লিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি চিনতে ওই ছেলেকে?'

লিলি মাথা নাড়লো। ও চিনতো না।

'আপনি জানলেন কীভাবে ওই ছেলের কথা?' আমি ওর মাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ও নিজেই মাসখানেক আগে আমারে বলছে।'

'আপনার পরিচিত কেউ?'

'হ্যাঁ, ওরে তো ছোটকাল থেকে চিনি। বদের হাড্ডি। পদ্মর সাথে ওর আগে সম্পর্ক ছিল। এরপর পদ্মকে ঠকায় বিয়া করছে। এখন নাকি আবার সম্পর্ক করতে চায়।'

আমি বুঝতে পারলাম পদ্ম'র প্রাক্তন প্রেমিকের কথা বলছেন উনি। ওই ছেলের সাথে ওর আবার যোগাযোগ হয়েছে সেটা জানা ছিল না আমার।

'ওই ছেলের সাথে কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, এমন ভান ধরছে যেন পদ্মরে গত এক বছর দেখেই নাই। আমরা আজকে মামলা করতেছি, ওই পোলাই আমার মেয়েরে গুম করছে।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, 'আচ্ছা, এই ঘটনা। তাহলে ধৈর্য ধরেন। দেখেন চলে আসে কিনা।'

পদ্ম অবশ্য আসলো না। মাস পেরিয়ে গেল।

পুলিশ ওর প্রাক্তন প্রেমিক ছেলেটাকে আটকে রেখে বেশ কিছুদিন জিজ্ঞাসাবাদও করলো। তবে ওর থেকে এখন পর্যন্ত পদ্মর কোনো খোঁজ মেলেনি।

আমি লিলিকে ফোন দিয়ে মাঝে মধ্যে আপডেট নিতাম। একদিন বলল, পদ্ম একটা চিঠি পাঠিয়েছে। শুনে বেশ অবাক হলাম, আশ্বস্থও হলাম।

চিঠিতে লিখেছে, সে অতি শীঘ্রই ফিরে আসছে না।

কিছুদিন পর আমি আবার ওদের বাড়িতে যাই। তখন লিলি চিঠিটা আমাকে দেখায়।

একটা ছোট চিরকুটের মত করে একটা হাতের লেখা চিঠি।

আমি নিয়ে পড়া শুরু করি।

মা,
আমাকে শুধু শুধু খুঁজবা না। আমি ভাল আছি। যদি ইচ্ছা হয় পরে ফিরবো। ঝামেলা না করে নিজের কাজ করো।

লিলি,
ঠিক মতো পড়াশোনা করবি। রেজাল্ট খারাপ হলে তোমার খবর আছে। এসে পিটুনি দিয়ে যাব!

ইতি,
পদ্ম

চিঠি পড়ে মুচকি হাসলাম। মেয়েটার সেন্স অব হিউমার ভাল। লিলিকে বললাম, 'তোমার রেজাল্ট খারাপ হলে দেখা যাচ্ছে একটা সম্ভাবনা আছে পদ্ম ফিরে আসার। তোমার মা কে দেখাইছো?'

'হ্যাঁ, মা চিঠি পেয়ে বলছে উনি যা সন্দেহ করছে সেটা যে সত্যি তা প্রমাণ হলো।'

'হুম, সেটা বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে এতদিন পালিয়ে থাকবে? ও কি আন্টিকে অনেক ভয় পায়?'

লিলি মুখ নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা পায়। মা তো খুব কড়া। ছোটবেলা থেকে অনেক শাসন করেছে।'

'আচ্ছা, মেকস সেন্স। পুলিশে জানিয়েছো চিঠির কথা?'

'হ্যাঁ, মা গিয়ে দেখিয়ে এনেছে থানায়। তবে ওনারা নাকি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। পুলিশের ধারণা কিছুদিন পরই ফিরে আসবে। তবে ওরা আশ্বাস দিয়েছে চিঠি যে কুরিয়ার দোকান থেকে পাঠানো হয়েছে সেখানে খোঁজ নেবে।'

'চিঠির খামে কিছু আছে?'

'না, শুধু চিরকুটের মত চিঠিটা!'

'ওর ফোন কি সাথে নিয়ে যায়নি?'

'উহু, সব বাসায় ড্যামেজ করে গেছে, পানিতে ডুবিয়ে আর ভেঙে নষ্ট করে গেছে। ওটাও পুলিশ চেক করে দেখেছে। বলল, ড্যামেজ হওয়ার কারণে কোনো ডাটা উদ্ধার করা সম্ভব না।'

আমি বেশ অবাক হলাম, 'নিজেকে লাপাত্তা করতে তো বেশ পারদর্শী তোমার বোন।'

'হ্যাঁ, তাই তো!'

এরপর অনেকদিন আর ওদের খোঁজখবর নেয়া হয়নি। লিলির কলেজ শেষ হওয়া অব্দি ওর মা আর ও ওই বাসাতেই থাকবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল পদ্ম এমনিতেই কোনো দিন ফিরবে। পদ্ম নিয়মিত ওদের চিঠি দিত, লিলি আর ওর মা'র খোঁজ নিত। একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়েছিল, সেটাতে রিপ্লাই দিতে বলতো।

৫.

আমি আর লিলি থানার একটা অফিস কক্ষে গিয়ে বসলাম।

পুলিশ অফিসার ফারুক সাহেব আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে জিডির কপিতে চোখ বুলালেন, 'একমাস দশ দিন ধরে মিসিং?'

'জ্বি' আমি সায় জানালাম।

উনি আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে নতুন দেখছি, ওনার মা আর বোন আগে এসেছিলেন। আপনি?'

'আমি ডক্টর আসিফ, ওদের প্রতিবেশী বলতে পারেন। ওনার মা একটু অসুস্থ, তাই আসতে পারেননি।'

'আচ্ছা, কিন্তু প্রতিবেশি হলে তো আপনার সাথে আমি এ আলাপে যেতে পারবো না। এটা ফ্যামিলি ম্যাটার।'

'যে মেয়েটা হারিয়ে গেছে,' একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওর সাথে আমার দীর্ঘদিন কথা হচ্ছিলো, এমনকি একটা সম্পর্কের দিকে যাওয়া যায় কিনা সেটাও ভাবছিলাম আমরা।'

আড়চোখে দেখলাম লিলি আবার ঘাবড়ে গেল কিনা। ও একটু চমকেছে কিন্তু কিছু বলল না।

'বলেন কি! তাহলে তো আপনার একটা স্টেটমেন্ট রাখা দরকার। কিন্তু আপনার কথা ওনার মা কিন্তু বলেননি আগে।'

'হ্যাঁ, ওনারা পুরো ব্যাপারটা জানতেন না, মানে জানানোর সুযোগ হয়নি।'

'কিন্তু আপনাদের সন্দেহ মেয়েটি তার প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে পালিয়েছে?'

'এটা ওর মা'র সন্দেহ। আমি নিশ্চিত নই। আমার ধারণা ছিল সে আমার ব্যাপারে সিরিয়াস। তবে এটা ঠিক পদ্ম হঠাৎ করেই আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় মাস তিনেক আগে। তখন আমি ভেবেছিলাম ও সময় নিচ্ছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে আপনি স্টেটমেন্টটা দিয়ে ফেলুন।'

এরপর আমি পদ্ম'র সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা শুরু থেকে বললাম। থানার একজন টাইপিস্ট সেটা টাইপ করে রাখলো।

স্টেটমেন্ট দেয়া শেষে ফারুক সাহেব বললেন, 'যেসব জায়গা থেকে ওনার বোন কুরিয়ার করেছে সেসবের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ আমরা নিয়েছি। শেষ ও পুরনো ঢাকার শাঁখারি বাজারের কাছের একটা কুরিয়ার থেকে কুরিয়ার করেছে। এর আগে করেছিল হাজারি বাগ থেকে। ওনার বোন তারমানে ঢাকাতেই আছে।'

'যে ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল তার সাথে আছে কিনা সে ব্যাপারে...'

'ছেলেটি থেকে আমরা কিছু বের করতে পারিনি।'

থানা থেকে বের হয়ে লিলিকে বললাম, 'স্যরি, তোমাদের আগে বলা হয়নি পদ্ম'র সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছিলো সে ব্যাপারে।'

লিলি বলল, 'আমি জানি।'

'জানো?'

'হ্যাঁ, ও আমাকে বলেছে।'

'আচ্ছা!'

'আপনি কি ওকে পছন্দ করতেন?'

ওর প্রশ্নে আমি একটু অপ্রস্তুত হই, 'হ্যাঁ করতাম। মানে প্রথমে আমি রাজি ছিলাম না, কারণ মনে হচ্ছিলো পদ্ম একটা শূণ্যস্থান পূরণের জন্য আমাকে বলেছে। কিন্তু পরে আমার মনে হয় ব্যাপারটা সিরিয়াস।'

লিলি আর কিছু বলল না।

পুলিশ অফিসার ফারুক সাহেব যেসব কুরিয়ারের কথা বললেন সেসব জায়গায় খোঁজ নেয়ার জন্য আমরাও চেষ্টা চালালাম। পরের কয়েকদিন আমরা সেসব জায়গায় গিয়ে গিয়ে মিসিং লিফলেট বিলি করে বেড়ালাম পাবলিক প্লেসগুলোতে। লিলি একটা মিসিং লিফলেট বানিয়েছে পদ্মের ছবিসহ। কুরিয়ার সংলগ্ন এলাকাগুলোর দেয়ালে সেসব সেঁটে আসলাম।

তাতে খুব একটা কাজ হলো না। দু'য়েকটা আজে বাজে ফোনকল ছাড়া আর কিছু লাভ হল না। তবে সপ্তাহখানেক পর পদ্মর থেকে আরেকটা চিঠি পেলাম আমরা।

সেখানে ও লিখেছে–

দয়া করে এসব করো না। আমি সময় হলে ফিরবো!

একটা ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া গেল। পদ্ম তারমানে ঢাকাতেই কোথাও লুকিয়ে আছে, তাই ওর চোখে লিফলেটগুলো পড়েছে। অথবা ওর সাহায্যকারী কেউ আছে যে ঢাকায় বসে ওকে সাহায্য করছে।

৬.

পদ্ম ফিরে আসলো না। কয়েকমাস কেটে গেল। লিলি আর ওর মায়ের সাথে আমার যোগাযোগও বেশ কমে গেল। ওরা এলাকায় আছে কি নেই সেটাও জানতাম না।

হঠাৎ একদিন লিলির সাথে আবারও দেখা হল। এবারও রোগী হিসেবে।

আমি হাসপাতালে ছিলাম না, একটা কাজে ঢাকার বাইরে ছিলাম। হঠাৎ ফোন পেলাম ওর মা থেকে।

বললেন, 'লিলির তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা। গায়ে জ্বর। একদুইবার বমি করেছে।'

আমি বললাম, 'দেরি না করে হাসপাতালে চলে যান। আমি ফোন দিয়ে বলে দিচ্ছি।'

ফোন দিয়ে শুনলাম, ডা. শারমিন আছে ডিউটিতে। বললাম, 'একটা মেয়ে আসবে। মনে হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন। ভর্তি দিয়ে একজন সার্জনকে কল করো।'

শারমিন খানিক পর ফোন দিয়ে বলল, 'ভাইয়া, ওনারা এসেছেন। আমি ভর্তি দিয়েছি। এক্সামিন করে মনে হল, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। ইমিডিয়েট সার্জারি লাগবে।'

'ওকে, রফিক স্যারকে কল করো।'

'ঠিক আছে।'

আমি পরদিনই ঢাকা চলে এলাম। ইতিমধ্যে লিলির অপারেশন হয়ে গেল। কোনো ঝামেলা হয়নি। পোস্ট অপারেটিভ রুম থেকে কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়ে গেল আমি আসার আগেই।

সন্ধ্যার দিকে আমি ওকে দেখতে গেলাম রাউন্ডে। সব কিছু ঠিক মনে হল। একটা ব্যাপার ছাড়া। তবে সেটা চেপে গেলাম।

ওর মাকে দেখে মনে হল বেশ ঘাবড়ে গেছেন। চোখ মুছে বললেন, 'আজকে পদ্মটা থাকলে কতটা ভরসা পেতাম। ডাইনী মেয়ে । এই বিপদের সময়ও ফিরে আসলো না।'

লিলিকে বললাম, 'কেমন লাগছে?'

'ভাল ভাইয়া!'

'গ্রেট, কালকের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। টেনশন করো না।'

পরদিন লিলিকে কেবিনে রেখে ওর মা বাসায় গেলেন কিছু ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে আসতে। আমাকে বলে গেলেন যাতে ওকে একটু দেখে রাখি।

আমি হাতের কাজ শেষ করে লিলির কেবিনে গিয়ে বসি। ওর সাথে কিছু কথা আছে সেগুলো বলারও মনে হল উপযুক্ত সময়।

'তারপর এখন কেমন লাগছে?'

'ভাল ভাইয়া, আপনাকে থ্যাংকস!'

'তাহলে তোমরা দু'বোনই এই হাসপাতালে একবার করে ভর্তি হলে।'

আমার প্রশ্নে লিলির ভ্রু কুঁচকে গেল।

'পদ্ম কি ভর্তি হয়েছিল? ও তো আউটডোরে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, আগে হয়নি। এবার হল।'

মেয়েটি মনে হল ভূত দেখার মত চমকেছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে ফেলল।

'তাহলে আপনি ধরে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ, পদ্ম। খুব সহজেই। তোমার অপারেশন এর জায়গায় আগের ইনজুরির দাগ থাকার কথা ছিল। একই জায়গায় অপারেশন হয়েছে। গতদিনই আমি খেয়াল করি, আগের ইনজুরির কোনো চিহ্ন নেই।'

লিলির মুখ দেখে মনে হল নিজের বোকামির জন্য আফসোস করছে। অন্য একটি হাসপাতালে গেলে ব্যাপারটা হয়তো ধরা পড়তো না।

আমি জিজ্ঞস করলাম, 'কেন করছো এসব?'

'প্লিজ, আপনি মা'কে কিছু বলবেন না।'

'মাকে বলবো না পুলিশকে বলবো সেটা পরে সিদ্ধান্ত নেব। আগে বলো লিলি কই?'

লক্ষ করলাম ওর চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। টিস্যু এগিয়ে দেয়ার মত ভদ্রতাও করতে ইচ্ছা হল না।

মেয়েটা কোনো ভয়ংকর সাইকোপ্যাথ সে সন্দেহ হচ্ছিলো।

'লিলি মরে গেছে!' খানিকটা পর ধাতস্থ হয়ে ও বলল।

'কীভাবে?'

'প্রথমবার যখন ওকে এখানে নিয়ে আসি, তখনও আসলে ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল। আমি সেটা সন্দেহ করেছিলাম, ইনফ্যাক্টও আপনিও সে সন্দেহ করেছিলেন। ও স্বীকার করেছিল পরে আমার কাছে। ও ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড ছিল। তবে আমার ধারণা ছিল ও আবার ট্রাই করবে না। একজন সাইকিয়াট্রিস্টও ওকে দেখছিলো।

সেবার ও বেঁচে গেলেও সেকেন্ড টাইম ওকে আমি বাঁচাতে পারিনি।'

'কীভাবে মারা গেল?' আমি সর্তক হয়ে প্রশ্নটা করি।

'ও ঘুমের বড়ি খেয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি। মাস পাঁচেক আগে একদিন বাসায় একটু লেট করে ফিরি। রাত ১১টার দিকে। দেখি ও ঘুমিয়ে আছে। আমি ভেবেছিলাম আর্লি ঘুমিয়ে গেছে। পরেরদিন সকালেও আমি ও ঘুমাচ্ছে চিন্তা করে বেড়িয়ে যাই। ওই দিনও আমার ফিরতে লেট হয়। পরে রাতে আবিষ্কার করি ও গতদিন থেকেই ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের বড়ির খালি পাতা পাই কয়েকটা। ততক্ষণে ও মারা গেছে। চোকিং হয়েছিল ঘুমের মধ্যে।

ও আমার জন্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। সেখানে ও বলে দিয়েছিল কীভাবে আমি ওর দেহটা হাইড করতে পারবো। এবং কীভাবে তারপর আমাকে কিছুদিন ওর চরিত্রে অভিনয় করে পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মনে হয় ও পালিয়ে গেছে। ও আসলে বেশ বুদ্ধিমান ছিল, আমি সেটা বুঝতে পারতাম না। একটা পার্ফেক্ট প্ল্যান বানিয়ে রেখে গেছিলো আমার জন্য।'

'তারমানে, তুমি দুইবোনের চরিত্রে অভিনয় করে গেছো বেশ কিছু সময়?'

'হ্যাঁ!'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার মেয়েটা বলে যাচ্ছে।

'আমি ভেবেছিলাম ওর কথা শুনবো না। সবাইকে ডেকে আর দশটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মত এটাকে গ্রহণ করি। কিন্তু তাতে ওকে অসম্মান করা হয় সেটা ভেবে করতে পারিনি। ও চাচ্ছিলো না, ওর এই মৃত্যুর কারণে আমি পারিবারিক ভাবে হেনস্থার শিকার হই।'

'হেনস্থার শিকার?'

'হ্যাঁ, কারণ ওকে আমি টেক কেয়ার করছিলাম। ওর কিছু হওয়া মানে আমার দিকে সবাই আঙুল তুলবে এটা ও জানতো। তাছাড়া ওর এমন মৃত্যুতে আমাদের মা'ও ভয়ংকর শকে চলে যেত, সেটা সহ্য করতে না পেরে মারা যেতে পারতো ইত্যাদি ও ভেবেছিল। তখন আমি আরো বিপদে পড়বো। সব মিলিয়ে ও এসব প্ল্যান করে।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। সুইসাইডাল পেশেন্টরা অনেক কিছুই করার চেষ্টা করে তার মৃত্যুর পর পরিবারের ক্ষতিকে মিনিমাইজ করার জন্য। তবে নিজের সুইসাইড করার তীব্র ইচ্ছাটাকে পরিবর্তন করতে পারে না।

'লিলি কি চেয়েছিল ওর চরিত্রেই তুমি থেকে যাও?'

'না, ও চেয়েছিল ও নিজে পালিয়েছে সেটা যাতে আমি সাজাই। আমি সেটা পরিবর্তন করি।'

'কেন?'

'কারণ তাই করতে গেলে ওর ইচ্ছাটা পূরণ হবে না। ও পালিয়ে গেলেও আমার আত্মীয় স্বজন সেটার জন্য আমাকেই দায়ী করবে আর মাও ওর মারা যাওয়ার মতই শোকে পড়বে। তারচেয়ে পদ্ম মানে আমি যদি পালাই এ দুটোর কোনটাই হবে না। পদ্মর পালানোতে লিলিকে দোষারোপ করা যায় না, আর মা'ও জানে আমি পালিয়ে থাকলেও নিজে নিজে চলতে ফিরতে জানি। আমি পদ্ম হিসেবে আজীবনই মা'র সাথে যোগাযোগ করে যাব। চাইকি দেখাও করবো ভবিষ্যতে লিলি যখন মা'র কাছে আর থাকবে না।'

'হুম, গুড প্ল্যান! কিন্তু তুমি এটা চালিয়ে যেতে পারবে?'

'যেতেই হবে। আমি আমার বোনকে একমাত্র এভাবেই বাঁচিয়ে রাখতে পারি।'

আমি ঘড়ি দেখলাম। আমার রাউন্ডের সময় হয়ে গেছে। ওর মা শীঘ্রই চলে আসার কথা। আমি উঠে পড়লাম।

রুম থেকে বের হওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি এখনো আমাকে পছন্দ করো?'

'পদ্ম করে, আমি করি না। আমি এতদিনে লিলি হয়ে গেছি!'

আমি হেসে ফেললাম, 'পদ্ম কি ফিরে আসবে না?'

'না, পদ্ম ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। তাই আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনি পদ্মকে ক্ষমা করে দিয়েন। পদ্ম সত্যি আপনাকে ভালবাসতো।'

'লিলিও কি তাহলে আমাকে ভালবাসে না?'

ও একটু থেমে বলল, 'লিলি আপনাকে সবসময়ই শ্রদ্ধা করে যাবে, কারণ তার বোন আপনাকে ভালবাসতো।'

পদ্মের সাথে আমার আরেকবার কথা হয়েছিল এরপর, রিলিজের দিন। ও আমার রুমে এসেছিল বিদায় নিতে। ওর মা বলছিলো, ঢাকায় আর একা একা রাখবে না মেয়েকে। সাথে করে নিয়ে যাবে। ওখানকার কোনো স্থানীয় কলেজে ভর্তি করিয়ে দিবে।

ওর মা বাইরে বেড়ুতেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করা হয়নি। লিলির ডেডবডি তুমি হাইড করলে কীভাবে?'

ও একটু ইতস্তত করে শেষমেশ বলল, 'আপনি ইয়ানোমামিদের কথা জানেন?'

'ইয়ানোমামি? না তো!'

'ওরা একটা ট্রাইবাল জাতি। দক্ষিণ আমেরিকার।'

'আচ্ছা, তো?'

'লিলি বলেছিল ওদের মত সৎকার ব্যবস্থা এ অবস্থায় সবচেয়ে সেফ, আমিও যেন তাই করি।'

'মানে? ওদের সৎকার ব্যবস্থা কী?'

'সেটা আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমি এখন আসি।'

ও যাওয়ার পর আমি ইয়ানোমামিদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করলাম। এ সব ব্যাপারে আমার বন্ধু এহসান ভাল জানার কথা। ওকে ফোন দিলাম।

'ইয়ানোমামি? হ্যাঁ কী হয়েছে?'

'ওদের সৎকার ব্যবস্থাটা কী ধরনের?'

'উম, ওহ হ্যাঁ মনে পড়েছে, এন্ডোক্যানিবালিজম?'

'মানে?'

'মানে আত্মীয় স্বজনরা মৃতের দেহকে নিজেরা খেয়ে ফেলে!'

পিঠের পিছনে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন বয়ে যায় আমার।

'কী বলছিস?'

'হ্যাঁ, এমন বেশ কিছু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে, যারা মনে করে আপনজনদের খেয়ে ফেললে আপনজনের আত্মা শান্তি পায়! কেন জানতে চাচ্ছিস?'

আমি সেটার উত্তর না দিয়ে ফোন রেখে দেই।

আমার গা শিরশির করতে থাকে।


আন্না

সব সুস্থ মানুষ একই রকম, অসুস্থ মানুষেরা নিজেদের মত করে নানা ভাবে অসুস্থ। তলস্তয়ের আন্না কারেনিনা উপন্যাসটা এভাবেও শুরু হতে পারতো। অবশ্য এভাবে একজন ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ হয়তো ভাববে না। ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস যিনি করেন তার কাছে পুরোপুরি সুস্থ মানুষ বেশ বৈচিত্রহীন প্রাণী, রোগ ব্যাধি থাকলেই তাকে নিয়ে ভাবা চলে।

তবে যিনি ডাক্তার নন তার কাছে ব্যাপারটা উল্টো হওয়ার কথা। তার কাছে সব অসুস্থ মানুষ একই রকম, সুস্থরা নানা প্রকারের, নানা ধরনের। সুস্থ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জিজ্ঞেস করলে তারা নানা কিছু বলবে, কেউ সামনের ছুটিতে পাহাড়ে কি সাগরে বেড়াতে যেতে চায়, কেউ চায় নতুন একটা থাকার জায়গা, কেউ পালাতে চায়, কেউ আরো ধনী হতে চায়, অর্থাৎ শেষ করা যাবে না তাদের উদ্দেশ্য লিস্ট করতে শুরু করলে। আর একজন অসুস্থ মানুষ এদিক দিয়ে একদমই সোজাসাপটা, সে চায় শুধু সুস্থ হতে!

ডাক্তারি জীবনের একটা সাধারণ ঘটনা হল, নবজাতকের নাম দেয়া। সদ্য জন্মানো কোনো শিশু যদি আপনার রোগী হয়ে আসে, এবং আপনার হাতের মাধ্যমে যদি শিশুটির জীবন রক্ষা পায় তাহলে প্রায়শই কৃতজ্ঞ মা-বাবা অনুরোধ করে শিশুটির জন্য একটি নাম ঠিক করে দিতে, শিশুর জীবন রক্ষাকর্তার একটি চিহ্ন তারা শিশুটির নাম হিসেবে সংরক্ষণ করতে চান, এটা সম্ভবত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম। পেডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি খুব অল্প সময়ের জন্য, তারপরও এই অনুরোধের মুখোমুখি হয়েছি বেশ কয়েকবার। আমি খুব বিনয়ের সাথে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রতিবার হেসে বলেছি শিশুর বাবা-মা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউ এই নামকরণের সুযোগ পাক সেটা আমি মানতে পারি না।

তবে একটি রোগীর নাম আমাকে দিতে হয়েছিল। সেই ঘটনাটা বলতেই এতক্ষণ ধরে এতকিছু বলা। তবে এই ঘটনাটা একটু ব্যতিক্রম, আমার নিজের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাই শুরু করতে গিয়ে বেশ খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি।

সেসময়ে আমি যে জায়গায় কাজ করতাম সেটার নাম ছিল নিজকারাবাল্লা। ছোট্ট একটা পাহাড়ি শহরতলী। ওখানে একটা হাসপাতালে রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করছিলাম। একটা ছোট এনজিও হাসপাতাল। দুর্গম জেনেও ওখানে কাজ করতে রাজি হই বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, জায়গাটা ভয়ংকর সুন্দর! হাসপাতালটা একটা পাহাড়ের কোলে, পাশেই খাসিয়াদের পল্লী, স্থানীয় বলতে তারাই। চাকরির সুবাদে অবশ্য নানা জায়গার লোকজন ছিল। আর প্রচুর টুরিস্ট আসতো। ডিউটি শেষে প্রতিদিন পাহাড়ি রাস্তা ধরে ঘুরে বেড়াতাম। শহরটার চারপাশ ঘিরে ঘন অরণ্য, হাঁটতে হাঁটতে দেখা মিলতো নাম না জানা পাখপাখালির। খাসিয়াপল্লীতে আমার মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখলে ওরা ডাক্তার সাব বলে এগিয়ে আসতো, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওদের কারো বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসতাম। ওদের কোনো অনুষ্ঠান হলে দাওয়াত পেতাম।

শহরে যে বাড়িতে থাকতাম সেটা দো'তলা একটা বাড়ি, হাসপাতালের কাছেই। আমার সাথে অন্যান্য এনজিওতে কর্মরত কিছু অল্পবয়েসি ছেলে ছিল। ওদের সাথে আমার খুব একটা খাতির ছিল না। দু'এক বার ওদের আড্ডায় গিয়ে বুঝেছিলাম আমার সাথে মিলবে না। মদ গাঁজা নিয়ে পড়ে থাকা ছেলেপিলে। এলাকার মেয়েরা কে কতটা সুন্দর, কে কখন কাকে পটিয়েছে– এসব আলোচনায় বুঝলাম ওরা যাদের নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না। আমি এত ঘুড়ে বেড়াই সেটার উদ্দেশ্য কী হতে পারে তা নিয়ে খোঁচামূলক ঠাট্টা আর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনে শুনে আমি বিরক্ত হয়ে এখন পারতপক্ষে ওদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি না। তাই বলা চলে, অফিস শেষে কিছুটা নিজের মতই থাকি।

হাসপাতালে ব্যস্ততা ভালই থাকে। আশেপাশে কোনো ভাল হেলথ ফ্যাসিলিটি না থাকায় রোগী প্রচুর হয়। আর আমি এখানে দায়িত্ব নেয়ার পর নতুন নতুন অনেক সেবা চালু করেছি। আগে একটু সিরিয়াস রোগী হলে হাসপাতালের কেউ রাখতে চাইতো না, রেফার করে দিত বড় কোনো হাসপাতালে। আমি এটা কমিয়ে এনেছি। বড় এক সাহায্য সংস্থার অনুদানে এ হাসপাতাল চলে বলে ফান্ড নিয়ে সমস্যা ছিল না, চাইলেই যেকোনো আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিত। সে সুযোগটা আমি পুরোদমে নিতাম। এক্সরে মেশিন, আল্ট্রা সাউন্ড থেকে শুরু করে

ছোটখাট ওটি করার জিনিসপত্রও ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছিলাম। আমি ছাড়া আরো দু'জন ডাক্তার কাজ করতো রোস্টারে, নার্স ছিল ছয় জন আর অন্যান্য স্টাফ মিলিয়ে প্রায় জনা কুড়ি লোক। এদের নিয়ে ভালই সময় কেটে যেত।

ঘটনাটা গত বছরের শেষের দিকে। অক্টোবর মাস। শরতের নীল আকাশ আর মন ঠাণ্ডা করার বাতাসের দিন শুরু হয়েছে সবে। সারাক্ষণ শো শো করা বাতাসের শব্দ শোনা যায়, বুনো ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে ঠেকে। হাসপাতালটা একটা টিলার উপর থাকায় ওর দো'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাজ শেষে ওখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের সারি দূর কোনো পাহাড়ের দিকে মিলিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে মন অজানা কারণে ভাল হয়ে যায়। রাতের বেলা যখন ডিউটি থাকে তখনও জায়গাটা আমার মন ভাল করার অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে, এখানে রাতের আকাশ এত পরিষ্কার, শত সহস্র নক্ষত্রেরা যেন অনেক নীচে নেমে আসে। ভালো মত তাকালে একটা ধোঁয়ার মত মিল্কিওয়ে বোঝা যায়।

একদিন সকালে ডিউটি করছি এমন সময়ে কয়েকজন স্থানীয় খাসিয়ারা একটা মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে হাজির হল। একটা পাহাড়ের খাদে নাকি মেয়েটা পড়ে ছিল। মেয়েটা বেঁচে আছে বোঝা গেল, কিন্তু জ্ঞান নেই। এমন জায়গায় খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে বেশি হলে, আরো কম হতে পারে। এই এলাকার নয় তা চেহারায় স্পষ্ট। কোঁকড়া এক মাথা চুল, ছোট গোলাকার মুখ, হাত পা সরু। দ্রুত ফ্লুইড দিয়ে ডিহাইড্রেশন ম্যানেজ করলাম, বিপি একদম নেমে গেছিলো। ধারণা করলাম ট্যুরিস্ট হবে। স্থানীয় থানায় একটা খবর পাঠালাম, ওরা জানালো এখন পর্যন্ত কোনো নিখোঁজ সংবাদ নেই, কেউ খোঁজ করার আগ পর্যন্ত হাসপাতালে যেন আমরা পর্যবেক্ষণে রাখি। মেয়েটার গায়ে আঘাতের বিশেষ চিহ্ন নেই। কয়েকজায়গায় শুধু চামড়া উঠে গেছে, হাত পায়ে কয়েকটা জায়গায় কালশিটে পড়েছে। কোনো হাড় ফ্র্যাকচার হয়নি মনে হল। তাও এক্সরে করার কথা বলে দিলাম। এক্সামিন করতে গিয়ে দেখলাম শরীরের দু'পাশে কানের নীচে আর গলায় পুরনো কাঁটা দাগ আছে, স্টিচের দাগ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পালপেট করে বুঝলাম বেশ পুরনো,

এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। জ্ঞান ফিরলে শোনা যাবে কী হয়েছিলো।

বিকেল গড়িয়ে গেল, মেয়েটা জ্ঞান ফিরলো না। ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে দেখলাম, ডিহাইড্রেশনও নেই। কেউ খোঁজ করতেও এল না।

নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর জামা কাপড়ের পকেট থেকে কিছু মিলেছে যাতে পরিচয় পাওয়া যায়?'

ওরা জানালো এমন কিছু পাওয়া যায়নি।

'স্যার, ভর্তি রাখবো না রেফার করে দেবেন?'

'রেফার কেন? সবকিছু তো ঠিকঠাক আছে। আমার ধারণা আজকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে?'

'নাম ঠিকানা নেই, পরে যদি ঝামেলা হয়?'

আমি বিরক্ত হলাম কিছুটা। বললাম, 'আজকে রাতটা দেখেন, জ্ঞান না ফিরলে আমরা পাঠিয়ে দেব।'

'মানে ভর্তি দিবো?'

'অবশ্যই, এখনো দেননি?'

'না অবজারভেশনে রাখা ছিল, কীভাবে ভর্তি দেব, নাম বয়স কিছু তো জানি না?'

সেসময়েই রোগীর নামের একটা প্রয়োজন তৈরি হল। বয়স আন্দাজ করে আমরা প্রায়ই দিয়ে থাকি রোগী ভর্তির সময়, কিন্তু নামতো আন্দাজ করা চলে না।

আমি নার্সকে বললাম, 'বয়স ধরে নিন ২৪ আর নাম হল আন্না।'

'আন্না?' নার্স মনে হল বিস্মিত হল।

'আপাতত দিয়ে দিন। পরে পরিবর্তন করা যাবে।'

নার্স আর কথা বাড়ালেন না। ভর্তির ফর্ম পূরণের জন্য উঠে গেলেন।

নামটা মাথায় আসলো কারণ সেসময় আমি আন্না কারেনিনার প্রথম খণ্ড পড়ে শেষ করেছি, দ্বিতীয় খণ্ড এখনো ধরিনি। ধরবো কিনা বুঝতে পারছি না, ননী ভৌমিকের অনুবাদে বইটা প্রগতি প্রকাশনী বের করেছে। না ধরে থাকা যাবে না। লেভ তলস্তয় বড় সাহিত্যিক না ননী ভৌমিক সে প্রশ্নও মাথায় জাগে মাঝে মধ্যে। সাহিত্যবোদ্ধারা এ সংশয় শুনলে তেড়ে আসতে

পারে, তবে আমার ধারণা [illegible] না। ভৌমিক জন্মালে হয়তো তিনি লেভ তলস্তয়কেও ছুঁতে পারতেন।

তাই অন্য কোনো নাম মাথায় এল না, নার্সও বিস্ময় গোপন করে এ নামই লিখলেন ভর্তি ফর্মে।

মিস আন্না, বয়স ২৪, ঠিকানা অজ্ঞাত

১.

আন্নার জ্ঞান ফিরলো পরদিন। সকালের রাউন্ডে নার্স জানালেন। ফিমেল ওয়ার্ডের একটা বেডে গুটিশুটি মেরে মেয়েটা পড়ে আছে।

গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম। মেয়েটা শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকালো শুধু, কোনো কথা বলল না। নার্স বললেন, 'জ্ঞান ফিরে এখনো কোনো কথা বলে নাই। মনে হচ্ছে না আমাদের কোনো কথাও বুঝতে পারছে।'

'ভাইটাল ঠিক আছে? বিপি চার্টটা দেন।'

নার্স ভাইটালের চার্ট দিলেন। সব নরমাল।

কয়েকটা ব্লাড টেস্ট এর অর্ডার করলাম।

'স্যার, পার ওরাল করে দেব?'

'হুম, দেন। স্যালাইন বন্ধ করে দেন। আর কথা বলার চেষ্টা করবেন প্রতিবার ঔষধ দেয়ার সময়।'

এরপর কয়েকদিন পার হয়ে গেল। রোগীর চাপে আলাদা করে মেয়েটার খোঁজ নেয়ার সুযোগ ছিল না। প্রতিদিন সকালের রাউন্ডে দেখা হত, চোখের দৃষ্টিতে মনে হলো একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছে। একজন সাধারণ মানুষের চোখে তার চারপাশ নিয়ে কৌতূহল থাকে, সেটা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। তবে এখনো কথা বলা শুরু করেনি। ডিউটি নার্সরা অনেকভাবে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তেমন কোনো লাভ হয়নি। মেয়েটা কারো কথা বোঝে বলেও মনে হয় না। কোনো লেখাও পড়তে বা লিখতে পারছে না।

কেউ যোগাযোগ করতে এল না। থানায় আবার যোগাযোগ করবো কিনা সেটা নিয়ে সংশয়ে ছিলাম। ভাবলাম আর কটা দিন দেখি। হাসপাতালে আছে, থাকুক। পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। মেয়েটা নিজের মত হাসপাতালের ভেতর হেঁটে বেড়াতে শুরু করলো। নার্সদের বলে দিলাম

বাধা না দিতে। আমার ধারণা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে, অ্যামনেশিয়া। অনেকক্ষেত্রে কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যায়।

সিলেটে একটা কাজ ছিল। সেই সুবাদে সুবিদবাজারে গিয়ে একটা লোকাল পত্রিকা আর একটা জাতীয় দৈনিকে মেয়েটার বর্ণনা সহকারে একটা বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা একটু কায়দা করে দিতে হল, অল্পবয়েসি একটা মেয়ের বিস্মৃতি নিয়ে একটা হাসপাতালে পড়ে আছে সেটা জানলে অনেক দুষ্ট লোক নানা ফন্দি আঁটতে পারে।

আমার ক্যামেরা দিয়ে মেয়েটার একটা ফটো তুলেছিলাম, সেটা একটা ফটো স্টুডিও থেকে প্রথমে প্রিন্ট করে নিয়েছিলাম। ফটোটা দিয়ে এভাবে লিখলাম:

'ছবিতে পাওয়া মেয়েটি একটি হাসপাতালে ভর্তি। মেয়েটির পরিচয় মেলেনি। বয়স আনুমানিক ২৪-২৫। যদি আপনার পরিচিত কেউ হয় তাহলে প্রমাণসহ যোগাযোগ করবেন। যদি মেয়েটির কোনো পারিবারিক ছবি থাকে তাহলে সেটা পাঠাবেন প্রমাণস্বরূপ।'

নীচে একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিলাম, ইমেইল অ্যাড্রেসটা নতুন খুলে নিয়েছিলাম যাতে কোনোভাবে বোঝা না যায় কার অ্যাড্রেস।

ফিরে এসে পরেরদিন রাউন্ডে মেয়েটির প্রথম কথা শুনলাম। স্বভাবঅনুযায়ী জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই যে আজকে কেমন আছেন?'

মেয়েটি একপলক আমার চোখে তাকিয়ে বলল, 'ভাল!'

আমার চেয়ে পাশে দাঁড়ানো নার্স মনে হল বেশি অবাক হল। বলল, 'স্যার এই ফার্স্ট কথা বলল।'

আমি আরো কথা বলার চেষ্টা করলাম। মেয়েটার কণ্ঠ খুবই মিষ্টি। চোখে মুখে যেমন একটা সারল্য আছে, কণ্ঠেও তাই।

কিন্তু ওই একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু মুখ দিয়ে বের করা গেল না। তবে প্রশ্ন করলে এখন বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে। রাউন্ডে সেদিন আমার সাথে ছিলেন সঞ্চিতাদি, আমাদের সবচেয়ে পুরনো নার্স, অনেকবছর ধরে এ হাসপাতালে আছেন। ওনাকে রাউন্ডের পর বললাম, দিদি এমনভাবে মেয়েটার সাথে কথা বলেন যেন আপনি তাকে ভাষা শেখাচ্ছেন। মানে শিশুদের আমরা যেভাবে শেখাই।

এতে কিছুটা কাজ হল মনে হল। দিদিও মনে হয় ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন। যখনই তিনি একটু অবসর পান দেখি মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে আছেন।

এরমধ্যে মেইলের কিছু রিপ্লাই পেলাম। অধিকাংশই নানা প্রশ্ন, কোথায় আছে মেয়েটা এধরনের জিজ্ঞাসা।

হাসপাতালের ঠিকানা না দিয়ে কত ভাল কাজ করেছি সেটা বুঝতে পারলাম।

তারা খুবই উদগ্রীব মেয়েটার লোকেশন জানার জন্য।

কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি কীভাবে মেয়েটাকে চেনে। একজন লিখেছে, 'মেয়েটাকে যদি চিনে থাকি, তাহলে সাবধানে থাকবেন।' কিন্তু কেন সাবধানে থাকবো সে প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। একজন লিখেছেন, এই একই মেয়েকে তিনি গত বছর দেখেছেন বলিভিয়ার এক ট্যুরে। পড়ে বিষম খেলাম।

মনে হচ্ছে না এতে কোনো কাজ হবে।

বিজ্ঞাপনটা দেয়ার প্রায় সপ্তাহখানেক পর এমন একটা ই-মেইল পাই যে আমি কিছুটা ভড়কে যাই।

একজন লিখেছে, 'মেয়েটাকে আমরা খুঁজছি বেশ কিছুদিন ধরে। কেন খুঁজছি সেটা জেনে আপনার কাজ নেই। তবে আপনি যদি নিজের নিরাপত্তা চান এবং আপনার আশেপাশের মানুষের মঙ্গল চান তাহলে আমাদের ঠিকানাটা দিন। আমরা এমনিতেও মেয়েটাকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো। মেয়েটা কোনো একটা হাসপাতালে আছে এটা জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কাজটা একটু সহজ হলো। তবে আবারও বলছি, আপনি দ্রুত ঠিকানাটা দিন, আমরা ন্যাশনাল সিকিউরিটির লোক। যে বিপদ হতে পারে তা থেকে আপনি আমাদের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবেন না।'

একটা স্পষ্ট থ্রেট। বাকি মেইলগুলোর মত এটাকে পুরোপুরি মাথা থেকে বাদ দিতে পারলাম না। মনে হল মেয়েটাকে হাসপাতালে আর রাখাটাও বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। বিজ্ঞাপনে হাসপাতালের কথা উল্লেখ করাটা ভুল হয়েছে।

পরদিনই মেয়েটাকে রিলিজের ব্যবস্থা করলাম। সঞ্চিতাদি তার বাসায় মেয়েটাকে আশ্রয় দিলেন আমার অনুরোধে, খুশি মনেই দিলেন মনে হল।

হাসপাতালে মেয়েটা পড়ে আছে সেটা তিনিও মেনে নিতে পারছিলেন না, আর ওর সাথে মেয়েটার একটা বন্ধনও তৈরি হয়েছে।

এখন দেখার বিষয়, মেয়েটার সবকিছু কতদিনে মনে পড়ে।

৩.

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা।

সঞ্চিতাদির ফোন পেলাম সন্ধ্যার দিকে। আমি কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি ডিউটি থেকে। চা হাতে নিয়ে একটা বই পড়ছিলাম।

'স্যার, একদল লোক আসছিলো, আন্নার খোঁজে!'

আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম। 'কী বলেন? কারা?'

'চার-পাঁচজন লোক। ফর্মাল শার্ট প্যান্ট পরা। দেখে ভয় লাগার মত একেক জন। প্রথমে ডিউটি ডাক্তার ফাহিম ভাইয়ের সাথে কথা বলল। জিজ্ঞেস করলো যে মেয়েটা ভর্তি ছিল সে কই!'

'কী বললো?'

'ফাহিম ভাই তো জানে না আন্না কই, সে বলছে আগে ভর্তি ছিল। এখন আর নাই। তারপর তারা খুব হম্বিতম্বি করলো। ফাহিম ভাই বলল, পুলিশে জানানো আছে, আপনারা পুলিশের সাথে কথা বলেন। এটা শুনে এরা শান্ত হল। সাথে সাথে বেড়িয়ে যায়।'

'আচ্ছা, গ্রেট। আন্না যে আপনার ওখানে তা আর কে জানে?'

'আমাদের নার্সরা জানে, ওরা আমাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে নাই।'

'আচ্ছা, বাকিদের আপনি বলে দিয়েন যাতে কেউ কিছু না বলে। এরা ভাল লোক মনে হচ্ছে না।'

'জ্বি স্যার, মনে হচ্ছিলো মেয়েটাকে কিডন্যাপ করতে আসছে! স্যার, আমার মনে হয় আপনারও বাসায় থাকা ঠিক হবে না। পারলে এখনই কোথাও বের হয়ে যান।'

আমার কাছে সেটা সুপরামর্শ মনে হল।

সাথে সাথে গেটে তালা মেরে বাড়ির পেছনের রাস্তা ধরে বাজারের দিকে চলে গেলাম।

বেশ রাত করে ফিরলাম।

যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হয়েছে। লোকগুলো আমাকে খুঁজতে এসেছিল। বিল্ডিংয়ের সব বাসাতেই নাকি নক করে জিজ্ঞেস করেছে আমি কই থাকতে পারি।

বেশ দুঃশ্চিন্তার বিষয়। পুলিশে জানাবো কিনা চিন্তা করলাম। ঝামেলা হতে পারে ভেবে আর জানালাম না।

সঞ্চিতাদির নাইটডিউটি ছিল। মনে হল তিনি ভয় পাচ্ছেন তার বাসায় না লোকগুলো গিয়ে আন্নাকে নিয়ে যায়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেই সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, কারণ তার বাসায় আন্না আছে সেটা ওদের কারো জানার কথা না।

ভোরের দিকে সঞ্চিতাদি আবার ফোন দিলেন।

'স্যার, লোকগুলো আবার এসেছে। হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছে।'

আমি ঘড়ি দেখলাম। সকাল ৬:৩০। 'এত সকালে?'

'হ্যাঁ, আপনি হাসপাতালে আইসেন না, খুব সম্ভবত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে!'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ, অলরেডি গার্ডকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কখন আসবেন। স্যার, একটা কাজ করেন। আপনি এলাকা থেকে চলে যান। ওদের সাথে অস্ত্র আছে মনে হল!'

'কী বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হল। লোকজনও আজকে বেশি এসেছে। সাথে মনে হচ্ছে বিদেশীও আছে। বদখত চেহারার লোকজন সব। আপনি পালান, আর আন্নাকেও নিয়ে যান। বাসায় আমার আম্মা আছে, তাকে বলে দিচ্ছি। রেডি করাতে বলছি। আপনি একটা গাড়ি নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যান ওকে নিয়ে।'

'রওনা হয়ে যাব?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটাই ভাল হবে। ওদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আজকে ওরা খুঁজে বের করবেই!'

ফোন রেখে আমি কয়েক মিনিট ভাবলাম। সঞ্চিতাদি যা বলেছে সেটা যৌক্তিক। মেয়েটা যেই হোক, গুরুত্বপূর্ণ কেউ। হয়তো কিডন্যাপড হয়েছিল, সেখানে থেকে পালাতে গিয়ে খাদে পড়ে জ্ঞান হারায় আর আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিডন্যাপাররাই আবার খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটির পরিবারের কেউ হলে ইমেইলে অন্যভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতো। এভাবে দলবেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতো না।

আমি আর না ভেবে পরিচিত এক ড্রাইভারকে ফোন দিলাম, তার গাড়ি নিয়ে মাঝে মধ্যেই সিলেট যাই।

আন্না রেডি হয়ে ছিল। দেখে মনে হল ও নিজেও বিপদটা টের পেয়েছে। সঞ্চিতাদির মা একটা ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছিলেন।

এতদিনে কথা বলার উপর আন্নার কিছুটা দখল এসেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমার সাথে সিলেট যাবে, ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ'

'কোনো ভয় নেই, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' ভাঙা উচ্চারণে ও সায় দিল।

'গুড, চলো!'

মনে হল আন্না এখন কথা সবই বোঝে। দ্রুত ওকে নিয়ে রওনা হলাম। ও একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে নিল। আমরা যথাসম্ভব মূল রাস্তার বিকল্প রাস্তা ধরে এগুলাম।

ঘন্টা দেড়েক লাগলো সিলেটে পৌঁছাতে। পুরো রাস্তাতেই একটা আতংক কাজ করছিলো। ফোনও বন্ধ করে রাখলাম। কত বড় গ্রুপের সাথে ঝামেলা করছি তা যেহেতু নিশ্চিত না তাই ফোন দিয়ে ট্রাক করতে পারে সেই সম্ভাবনাও মাথায় রাখলাম।

সিলেটে পরিচিত অনেকেই আছে। তবে ঠিক কোন বাসায় আন্নাকে নিয়ে উঠবো সেটা নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম। পরে ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজের এক বান্ধবী, যে এখন সিলেটে আছে কর্মসূত্রে ওর কাছে যাই। ওর সাথে একসময় বেশ দহরম মহরম ছিল, ও একটা মেয়েদের হোস্টেলে থাকে। সুতারাং খুব একটা ঝামেলা হবে না। হোস্টেলে আর কোনো সিট থাকলে তো হলই, না হলে ওর রুমেও থাকতে পারবে।

স্বর্ণা একটু ভড়কালেও দ্রুত রাজি হয়ে গেল আন্নাকে ওর সাথে রাখতে। আন্নাকে বলে নিয়েছিলাম আমি যা বলবো তাতে আপত্তি করো না। স্বর্ণাকে একটু মিথ্যে বলতে হল কিন্তু উপায় ছিল না। বললাম, আন্না আমার প্রেমিকা। একটু বেশি অন্তর্মুখী আর বাসা থেকে পালিয়েছে বলে একটু শকে আছে। বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিচ্ছে বলে পালিয়ে এসেছে আমার সাথে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আমরা বিয়ে করে ফেলবো।

এসব বললাম যাতে ওকে না ঘাটায় বেশি বা ওর কথা বলার অপটুতা দেখে কিছু সন্দেহ না করে।

আন্না বেশ সহযোগীতাই করলো। আমার মনে হল পুরো প্ল্যানটা ওরও ভাল লেগেছে। আজকে রওনা হওয়ার সময় ওর চোখে মুখে যে ভীতি ছিল সেটিও নেই।

আমার নিজেরও কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। মজিদের কাছে থাকা যাবে। মজিদ একটা ক্লিনিক চালায় এখানে। ওর ক্লিনিকে থাকার জায়গার অভাব হবে না।

৪.

মাসখানেক পেরিয়ে গেল। ফোন মারফত জানতে পারি আন্নাকে খুঁজতে আসা লোকজন এখনও হাল ছাড়েনি। মাঝে মধ্যেই নাকি হানা দেয়। ইতোমধ্যে আমি হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি, আমার পরিচিত এক জুনিয়রকে আমার দায়িত্বে পাঠিয়েছি। মনে হচ্ছে না খুব শীঘ্রই ওখানে আর ফেরত যাওয়া যাবে, অবশ্য এমনিতেও একই জায়গায় দীর্ঘ সময় আমার থাকা হয় না। নিজকারাবাল্লায় বছর খানেকের উপরে ছিলাম।

আন্নার সাথে মাঝে মধ্যে দেখা করে আসি। গার্লস হোস্টেলের ওয়েটিং রুমে ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে, আমি গল্প করে জানতে চেষ্টা করি ওর কিছু মনে পড়ছে কিনা। ও অদ্ভুত কিছু কথা বলে, যেমন ওর কিছু দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সেসব কোথাকার ও জানে না। একটা বিশাল গোলক, কাঁচের তৈরি। তার মধ্যে একটা অর্ধবৃত্তাকার একটা দরজা। সেখান হতে একদল মানুষ বের হচ্ছে, কেউ ঢুকছে।

আরেকদিন বলল, পাহাড়ের মধ্যে একটা জংলা পথ, লাল নীল অচেনা ফুল। ওর সাথে একটা বড়সড় কুকুর, প্রায় ওর সমান আকৃতির। ওরা ছুটছে কোনো এক অজানা কারণে।

আমি কোনো থই পাই না। বলি, 'মনে হয় স্বপ্নে দেখেছো।'

'হতে পারে!'

'তোমার সময় কাটে কেমন করে?'

'আমি বই পড়া শিখেছি। বই পড়ে সময় কাটাচ্ছি। স্বর্ণাপুর কাছে অনেক বই।'

'হ্যাঁ স্বর্ণা মার্কা মারা বইপড়ুয়া, বইতো থাকবেই। কিন্তু তুমি বই পড়াও ভুলে গেছিলে?'

'হ্যাঁ, তবে শিখে নিয়েছি কয়েকদিনেই। সঞ্চিতাদি শিখিয়েছেন, আপুও শিখালেন।

'আচ্ছা, কী বই পড়ছো?'

'কমলকুমার মজুমদারের একটা উপন্যাস।

আমি জিভ কাটলাম, 'পড়তে শিখেই এমন দাঁতভাঙা লেখা পড়তে শুরু করেছো! স্বর্ণাও দিল এসব পড়তে?'

'আমিই নিয়ে পড়েছি। আর আমি খুব দ্রুত শিখতে পারি।'

'আচ্ছা, তুমি কি মনে করতো পারো কেন তোমাকে কিছু মানুষ এমন পাগলের মত খুঁজছে?'

'উঁহু!'

'তুমি কোনো ফেরারি আসামি না তো?'

'হ্যাঁ, সেটা হতে পারি। যেহেতু কিছু মনে নেই, তারমানে সিরিয়াল কিলারও হতে পারি!'

আমি হেসে ফেললাম, 'তুমি কমলকুমারের বইয়ের নামে থ্রিলার গল্প পড়ছো না তো?'

এবার ওর মুখে অল্প হাসি ফুটলো।

আন্নার সাথে আমি নিয়মিত কথা বলছিলাম, আশা করে ছিলাম ওর কিছু মনে পড়বে। ওর অনুমতি নিয়ে আরেকটা বিজ্ঞাপন দিলাম পত্রিকায়। এবার আরেকটু সাবধানে দিলাম, কোনো লোকাল পত্রিকাতেও দিলাম না। একটা জাতীয় দৈনিকে দেওয়ালাম অন্য এক বন্ধু মারফত ঢাকা থেকে। যাতে কোনোভাবে বোঝা না যায় কোথা থেকে দেওয়া হচ্ছে। একই ভাবে নতুন একটা ইমেইল আইডি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দিলাম।

খুব একটা লাভ হলো না। একই রকম ইমেইলও আসলো কিছু। আজেবাজে।

এরপর কেটে গেল আরো কিছু মাস। স্বর্ণা ওকে একটা আলাদা রুম ঠিক করে দিল হোস্টেলে। আন্নার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো, যে মিথ্যা দাবি নিয়ে স্বর্ণার কাছে তুলেছিলাম সেটা সত্যি হতে শুরু করলো। আন্নার প্রতি আমার দুর্বলতা তৈরি হল। ও খুব সহজেই রাজি হল আমার প্রেমিকা হতে।

আমি বললাম, 'এমন যদি হয় হঠাৎ স্মৃতি পেয়ে দেখলে তোমার একটা রাজপুত্র টাইপ বর ছিল।'

আন্না মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'তাহলেও ছেড়ে দেয়া উচিত। এতদিনেও খোঁজ পেল না। ফালতু লোক কোথাকার!'

আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে তো হলোই। তবে আমাদের এ শহরে থাকা চলবে না। তোমাকে যারা খুঁজছে তারা না আবার কোন দিন ফিরে আসে।'

আন্নাকে নিয়ে পরে আমি ঢাকা চলে আসলাম। ঢাকায় আসার পর কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল কিছুটা নিরাপদ জায়গায় এসেছি। আন্না তারপরও রেগুলার স্কার্ফ পড়তো, আমিও আমার চুলের আর দাড়ির স্টাইল কিছুটা পরিবর্তন করলাম যাতে কেউ চট করে আগের চেহারার সাথে মিলাতে না পারে। থাকা শুরু করলাম উত্তরার দিকে। এক পরিচিত বন্ধুর সুবাদে একটা ক্লিনিকে কাজ জুটিয়ে ফেললাম।

হঠাৎ বিজ্ঞাপনে দেওয়া ই-মেইলটাতে অনেকদিন পর একটা মেইল পাই। ওপেন করবো কি করবো না এমন একটা সংশয় যদিও ছিল তাও ওপেন করি। একই সেন্ডার বেশ কয়েকটা মেইল পাঠিয়েছে দেখলাম। মেইলের ভাষা মোটামুটি এমন-

'আপনি মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখে ভুল করছেন। মেয়েটি খুবই বিপজ্জনক। এখনও সময় আছে আমাদের হাতে তুলে দিন।'

পড়েই ডিলিট করে দিলাম।

পরের মেইলটাতে লেখা,

'আপনি হয়তো আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না। মেয়েটি কত বিপজ্জনক তা যতক্ষণে বুঝবেন ততক্ষণে আপনার আর কিছু করার থাকবে

না। কেন বিপজ্জনক সেটা অতি গোপনীয় বলে সেই তথ্য আপনাকে আমরা দিতে পারছি না। আমাদের কাছে মেয়েটির ছবিও আছে, তবে সেসবই আপনাকে দেয়ার মত অনুমোদন আমাদের নেই। মেয়েটির ঠিকানা দিন যদি নিরাপদে থাকতে চান।'

একই অ্যাড্রেস থেকে শেষ মেইলটা সবচেয়ে রহস্যময় ছিল।

'আপনাকে পুনরায় সতর্ক করছি এবং অনুরোধ করছি সহযোগিতা করার। মেয়েটি অতি বিরল এক ব্যাধিতে আক্রান্ত। ও চিকিৎসার মাঝামাঝি সময় পালিয়েছে। ওর দেহে অস্ত্রোপাচারের চিহ্ন পাবেন, সুযোগ পেলে মিলিয়ে দেখতে পারবেন।

দেরি না করে আমাদের কাছে রিপোর্ট করুন, নতুবা আপনিও বিপদে পড়বেন!'

শেষ মেইলটা পেয়ে আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। আন্নার দেহে যে সেলাইয়ের দাগগুলো দেখেছিলাম সেগুলোর কথাই কি বলছে? ওরা কি মেয়েটার উপর কোনো এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিলো? যেমনটা নাৎসিরা বহুবছর আগে বন্দিদের উপর চালাতো। মাঝেমধ্যে কন্সপিরেসি থিওরির মত করে শোনা যায় ওই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা আজও চলমান।

তাই যদি হয়ে থাকে ওরা সেটা ধামাচাপা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে ক্রমাগত থ্রেট দেওয়ার চেষ্টাটা সেই কারণেই হয়তো।

সেদিন বাসায় এসে আন্নাকে জানালাম মেইলের কথা। ও নিজে আবার নিজের দেহের সেলাইয়ের মত কাটা স্থানগুলো ভালমত দেখলো।

ওর কানের নীচ থেকে একটা দাগ চলে গেছে একদম পায়ের পাতা পর্যন্ত। দাগটা কানের পেছন থেকে শুরু হয়ে গলা বেয়ে নেমে প্রথমে পিঠের দিকে গেছে, তারপর দিক পরিবর্তন করে সামনের দিকে কোমড় বেয়ে নেমেছে। শরীরের দু'দিকেই। মনে হচ্ছে কেউ যেন চেষ্টা করেছিল ওকে পাশ থেকে দু'ভাগ করে ফেলতে।

আন্না দাগগুলোতে হাত বুলিয়ে বললো, 'আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। ওরা আমাকে নিয়ে কী করেছে!'

আমি স্বান্তনা দিয়ে বললাম, 'যাই করার চেষ্টা করুক সফল হয়নি। তুমি এসব নিয়ে ভেব না। হয়তো পুরোটাই ভাওতাবাজি, আমাদের টেনশনে ফেলার জন্য বলেছে।'

আন্না আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি আসলেই এমন হয় আমার বড় কোনো অ্যাবনরমালিটি আছে। কোনো বিরল অসুখ?'

আমি হেসে বললাম, 'ডাক্তারি যেহেতু পড়েছি এবং বেশ ভালভাবেই পড়েছি, তারমানে এমন কিছু থাকলে এতদিনে ধরে ফেলতাম।'

'তারপরও, যদি হঠাৎ কিছু ধরা পড়ে?'

'ধরা পড়লে চিকিৎসা করা হবে। তবুও আমি ওদের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।'

আন্না মনে হল তারপরও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। অনেক চেষ্টা করেও মুড ভাল করতে পারলাম না। বাইরে খেতে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল, সেটাও যেতে চাইলো না।

মেইলের কথা বলে মনে হয় ভুলই করলাম। এখন এই মুড ঠিক হতে কতদিন লাগে কে জানে!

৫.

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। উল্টাপাল্টা মেইলও আর আসেনি। ওরা বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আন্নাকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আন্নাকে মাঝে একজন সাইকায়াট্রিস্ট দেখাচ্ছিলাম, কোনোভাবে যদি আগের স্মৃতি মনে করতে পারে। খুব একটা লাভ হয়নি। বেশ অনেকদিন হল নতুন কোনো সেশনে যাচ্ছে না। ওর যেতে ভাল লাগে না।

মাঝে মধ্যে ও বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নগুলো ওর খণ্ড খণ্ড স্মৃতির মত। একদিন ঘুম থেকে উঠে বসে বসে কাঁদছিলো। আমি জিজ্ঞেস করতে বলল, খুব বাজে ধরনের একটা স্বপ্ন দেখেছে। প্রথমে বলতে চাচ্ছিলো না কী দেখেছে, তারপর বলল, দেখলো একটা বনের মধ্যে ও দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। ওর হাত পায়ে রক্ত মাখা। পেছন থেকে কারা যেন ওকে তাড়া করছে। ওদের গাড়ির লাইট এসে পড়ছে ওর গায়ে। তারপর হঠাৎ দেখে সামনে এক বিশাল খাদ। পরে সেই খাদে লাফ দিয়ে ও পড়ে যাচ্ছে।

এ ধরনের স্বপ্ন ও দেখবে তাই তো স্বাভাবিক। ওই ভয়ংকর গ্রুপটা এখন আর খোঁজ না নিলেও ভীতিটা তো থেকে গেছে ওর মনে, এমনকি আমার মনেও।

সারারাত পরে আর ও ঘুমায় না। ভয়ে সিটিয়ে থাকে। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে রাখি, তাতে হয়তো একটু ভরসা পায়।

কিন্তু একই স্বপ্ন ও মাঝে মধ্যেই দেখে।

সাইকায়াট্রিস্ট যাকে দেখাচ্ছে ও আমার বন্ধু মানুষ, ডা. ওয়াসিফ। ওর মূল কাজ ছিল আগের কোনো স্মৃতি ও মনে করতে পারে কিনা।

একদিন দেখা হতে বললাম দুঃস্বপ্নের কথা। ওয়াসিফ বলল, 'হ্যাঁ এ ধরনের স্বপ্নের কথা আমাকেও বলেছিল। কিন্তু বারবার দেখে সেটা বলেনি। বারবার দেখার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, এটা স্বপ্ন না। কোনো স্মৃতি। হয়তো আসলেই ওকে কোনো একটা জায়গা থেকে পালাতে হয়েছিল।'

আমি সে সম্ভাবনা উড়িতে দেই না। সেটা হতে পারে।

ওয়াসিফ বলল, 'আরেকটা ব্যাপার। যদিও ওর তেমন কোনো স্মৃতি উদ্ধার করতে পারিনি। ও কিছু খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের কথা বলেছে আমাকে। যেমন কোনো একটা দুর্গম বনের ধারে বসে শীতে কাঁপছে। কিংবা একটা পাহাড়ি জায়গা, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, ওকে কিছু একটা তাড়া করছে ইত্যাদি। দৃশ্যগুলোতে কী মনে হয়?'

'কী মনে হয়?'

'মনে হয় ওর একটা দুর্গম প্রাকৃতিক জায়গায় বড় হয়েছে। একই সাথে এমন কিছু স্মৃতির কথা বলে যেগুলো খুব আরবান। যেমন বেশ বড় একটা রুমে বসে আছে, রুমের দেয়াল গুলো ইস্পাতের মত, নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ। এসবে মনে হয় কোনো একটা ল্যাবের বর্ণনা। মানে বেশ কন্ট্রাডিকটরি।'

'হুম, আমারও ধারণা ওর চাইল্ডহুড খুব ডিফিকাল্ট আর অ্যাটিপিকাল ছিল। কিন্তু দুঃখজনক, ওর স্মৃতি পুরোপুরি না ফিরলে সেটা জানা সম্ভব হবে না।'

'একটা কাজ করতে পারিস, মেমোরি রিট্রাইভ করার একটা পদ্ধতি হলো একই ধরনের পরিবেশে ঘুরতে যাওয়া।'

'ল্যাবে ঘুরতে যাব?'

'তোর মত লোকের মাথায় যে পাহাড়ি এলাকার অপশন পড়ে আসবে সেটাই স্বাভাবিক!'

ওয়াসিফের কথায় প্ররোচিত হয়ে বান্দরবানে এক সপ্তাহের একটা ট্যুর প্ল্যান করে ফেললাম।

৬.

ভ্যাপসা গরম পড়েছে। পাহাড়ি এলাকা হিসেবে গরমটা বেশ বেশি, ছোট একটা এসিতে কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

দু'দিন হল বান্দরবানে এসেছি। এমন একটা রিসোর্টে উঠেছি যেটা খুব একটা জনবহুল না। শহর থেকে বেশ দূরে। বেশিদিন হয়নি এটা হয়েছে। নাম হিলটপ স্টেশন। খুব ভাল মানের না হলেও আমি যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনি। ঝামেলাহীন একটা নির্জন জায়গা।

এখানে রাতের আকাশটা এত পরিষ্কার, অনেকদিন পর নিজকারাবাল্লার কথা মনে পড়লো আকাশ দেখে। ওই হাসপাতালে আমার আকাশ দেখার জায়গাটায় এখন কেউ আর চা কফি হাতে দাঁড়ায় কিনা কে জানে!

আন্নার মন ভাল হয়েছে মনে হল ঘুরতে এসে। অনেকদিন পর ওর মুখে হাসি দেখলাম।

গতকাল আর আজকে মিলে অনেকটা ট্রেকিং করলাম। পাহাড়ি পথঘাট আর পাথুড়ে ঝিরিপথে সারাদিন হেঁটে রাজ্যের ক্লান্তি ভর করেছে শরীরে। রাতের খাবার কোনোমতে খেয়ে শুয়ে পড়বো এই সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু গরমের কারণে ব্যাপারটা হল না। বারান্দায় কিছুক্ষণ বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আন্নাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর কেমন লাগছে?

ও বলল অনেকদিন পর ওর মনে হচ্ছে ও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

আমি বললাম, 'এমনটা হতে পারে তোমার শৈশব কেটেছে কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে?'

সেটার কোনো জবাব ও দিল না।

আমি যে স্মৃতি উদ্ধারের সেই ব্যর্থ চেষ্টার দিকে আবার যাচ্ছি সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় চুপ করে গেল।

আমিও আর ঘাটালাম না।

অন্যান্য বিষয়ে গল্প করতে করতে সময় কাটালাম।

রাত তখন প্রায় ১ টা বাজে। আমরা চিন্তা করছিলাম শুয়ে পড়বো। এখন একটু একটু শীত নেমেছে। পুরো রিসোর্ট ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ প্রায় চমকে উঠলাম। কেউ একজন দরজায় নক করছে।

এত রাতে?

আন্নাকে দেখে মনে হল ও নিজেও খুব ভয় পেয়েছে।

বলল, 'আসিফ, দরজা খুলো না।'

আমি বললাম, 'দাঁড়াও দেখি। এসব জায়গা তো নিরাপদ। হোটেলের কেউ কিনা?'

'হোটেলের মানুষ এত রাতে কেন আসবে?'

'দেখি, তুমি ভয় পেয়ো না।'

আমি দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

ওপাশ থেকে একটা ইতস্তত গলা শুনলাম, 'আসিফ ভাই?'

'হ্যাঁ, কে?'

'আসিফ ভাই। আমি রোমেল।'

'রোমেল? কোন রোমেল?'

'ভাই আমি আপনার পাশের রুমে থাকতাম, সিলেটে।'

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম কোন জায়গার কথা বলছে। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, এই ছেলেটার সাথে এক দুইবার কথা হয়েছে নিজকারাবাল্লায়।

খুবই বিরক্ত হলাম, 'সেটা চাপা না দিয়েই বললাম, এত রাতে কেন? সকালে কথা বলি?'

'ভাই, খুবই স্যরি। আপনি এই রুমে খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল। রিসোর্টের ম্যানেজার একটা গাধা, খোঁজ দিতে দেরি করে ফেলল। আমিও এখানে উঠেছিলাম। দূর থেকে আপনাকে দেখেছিলাম আজকে, কথা বলার সুযোগ হয় নাই। সকালে চলে যাচ্ছি ভাই। ভাবলাম একবার হাই বলে যাই। স্যরি, বিরক্ত করার জন্য। ঘুমান ভাই। আমি যাই।'

ভাবলাম, বেশি সতর্ক আচরণ করছি। তাই বললাম, 'দাঁড়াও। দরজা খুলছি।'

আন্না মনে হল না ব্যাপারটা পছন্দ করলো।

হাত ইশারায় আমাকে না করলো।

আমি ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করলাম। তারপর দরজা খুললাম।

দরজা খুলতেই রোমেল আর অন্য একটি ছেলে হুড়মুড় ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'ভাই, এত ডরান কেন? আমার বন্ধুর সাথে পরিচয় করায় দেই। ও মকবুল। আমরা দুইজন আসছি এখানে একটু ফূর্তি করার জন্য। কী সৌভাগ্য দেখেন আপনাদের পেয়ে গেলাম।'

ওদের গা থেকে সস্তা মদের গন্ধ আসছিলো। ফূর্তি কী করছিলো বুঝতে পারলাম।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে রোমেল। দেখা হল, ভাল লাগলো। পরে আলাপ হবে।'

'ভাই, এত অস্থির হইছেন কেন। রাত তো পড়েই আছে!'

এতক্ষণে ওরা রুমের সোফা দখল করে বসেছে। আন্না দেখলাম ভীত সন্ত্রস্ত মুখে রুমের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, 'রোমেল তুমি মাতাল হয়ে আছো। যাও। তা না হলে রিসোর্টের ম্যানেজারকে ডাকতে বাধ্য হব।'

রোমেল তাতে একগাল হেসে বলল, 'ভাই রেগে যাচ্ছেন কেন। আমরা কি ডাকাতি করতে এসেছি? আর আপনার প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই, এখানে আসলাম ভাবির জন্য।'

'মানে?'

'মানে সিম্পল। আপনি মেয়েটাকে নিয়ে পালায় গেলেন। যন্ত্রণা পোহাইলাম তো আমরা। আমাদের বাড়ি বাড়ি পুলিশের লোকজন রেইড করলো। ধরে নিয়ে গেছিলো। মাইরধোরও করছে। আচ্ছা, সেসব ভুলে গেছি।

তবে শোনেন, ভাবিকে যে অনেক উঁচুমহল থেকে হারিকেন দিয়ে খুঁজতেছে সেটা মনে হয় জানেন। আমি একটা ফোন দিলেই এখানে অনেকে চলে আসবে।'

'তুমি কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই, আমরাও চাই আপনি ওনাকে নিয়ে ঠিকঠাক থাকেন। তবে কিছু টাকাপয়সা দিতে হবে, যাতে আমরা কাউকে ফোন না দেই।'

'রোমেল তোমার মাথা খারাপ!'

'মাসে দুইলাখ করে পাঠাবেন, আপনি ডাক্তার মানুষ, এক সপ্তাহর ভিজিট।'

'রোমেল, আমি এক পয়সাও দেব না।'

'দেবেন না?'

আমার মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে। বললাম, 'না, তুমি যা খুশি করো। যাও। টাকা পয়সা এত সস্তা?'

এরপর রোমেল যেটা করলো তা নিয়ে আশংকা করছিলাম, কিন্তু সত্যিই করবে বুঝতে পারিনি। ও হঠাৎ আমার উপর হামলে পড়লো। একটা প্রচণ্ড ঘুষির আঘাত অনুভব করলাম চোয়ালে। মাথা ঝিঝি করে উঠলো।

আন্নার একটা চাপা চিৎকার শুনলাম, স্বভাবতই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

রোমেল হিসহিস করে বল্ল, 'চুক্তিতে যেহেতু রাজি না। এখনই ওদের ফোন দিব। ওরা আমাকে ওদের ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে, যদি খোঁজ দিতে পারি তাহলে আমাকে পুরস্কৃত করবে সেটা বলে গেছে। তারপরও আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাইছিলাম।'

আমি প্রচণ্ড আক্রোশে ওকে পাল্টা আঘাত করার চেষ্টা করলাম। একজোড়া শক্তিশালী হাত আমাকে আকড়ে ধরলো পেছন থেকে। মকবুল ছেলেটাও আক্রমণ করছে।

আমি অসহায়ের মত দেখছিলাম রোমেল আন্নার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে প্রাণপণে মকবুলের বাহুমুক্ত করার চেষ্টা করলাম।

এমনসময় কিছু একটা ঘটলো। একটা মৃদু গর্জনের মত আওয়াজ হল। খাঁচায় আটকে থাকা কোনো বাঘ যেমন গরগর করে তেমন। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, আওয়াজটা আসছে আন্নার দিক থেকে।

ওর শরীর অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে যাচ্ছে। হাতগুলো উপরে দিকে প্রসারিত করে যেন ছাদ ছুতে চাইছে, দুইপায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হাঁটু ভাজ করে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো!

তারপর যে দৃশ্য দেখলাম তা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে অশরীরী দৃশ্য, ওর শরীর নিমেষে পাল্টে গেল। উপরের দিকে তাকিয়ে আন্না এমন ভাবে হা করে নিশ্বাস নিল যেন ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তারপরই ওর চোয়ালটা যেন ঠোঁটের দু'পাশ থেকে ভাগ হয়ে গেল, চোয়ালের হা'টা বড় হতে হতে

কান পর্যন্ত ছুয়ে ফেলল। তারপর ওর কানের নীচের যে স্টিচের দাগ ছিল সে বরাবর দেহটা প্রসারিত হওয়া শুরু হল। ওর ভেতর থেকে যেন আরেকটা প্রাণী বেড়িয়ে আসছে যেটা ওই দাগ বরাবর ভাঁজ হয়ে ছিল। বড় চোয়ালের দু'পাশে যে দাতের সারি সেটা দেহের অনেক ভিতরে গিয়ে শেষ হয়েছে মনে হল।

রোমেল ততক্ষণে চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়েছে। বিস্ময় আর প্রচণ্ড ভীতিতে ওর চোখগুলো কোটর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

আন্না একলাফে বিছানা থেকে নেমে রোমেলকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর ওর পুরো চোয়ালটা প্রসারিত করে রোমেলের মাথাটা মুখে পুড়ে নিল। মট করে একটা আওয়াজ হল, তারপরই আন্না যখন মুখটা উপরে উঠালো তখন ওর মুখে রোমেলের মাথা, গলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। মুখ থেকে মাথাটা ও এমনভাবে বাইরে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলল যেন ওটা একটা পিংপং বল, ভুলে মুখে পুড়ে ফেলেছিল।

মকবুল যে চিৎকার করছে তা টের পেলাম যখন আন্না শান্ত হয়ে এল। আমি ওকে আস্তে করে বললাম, 'পালাও!'

সাথে সাথে ও আমাকে ছেড়ে কোনোমতে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে পরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যেতেই, আন্না ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে গুটাতে শুরু করলো। দেহের ওই স্টিচ লাইন বরাবর অরিগ্যামির কাগজের টুকরোর মত নিজেকে যেন ভাঁজ করে নিল। তারপর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। দেয়াল ধরে ধীরে ধীরে বসে পড়লো।

আমি ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নিলাম। তারপর ওর কাছে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

'আন্না? তুমি কে?'

আমার প্রশ্নে আন্না ওর হাত আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো।

'আমি জানি না আসিফ, আমি কিছুই জানি না।'

ওর দেহটা শীতে কাঁপছিলো। পোশাক জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে। হাত দিয়ে বুঝলাম হাইপোথার্মিক কন্ডিশনে আছে। দ্রুত শুইয়ে দিলাম বিছানায়।

হয়।

'আসিফ, আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি?'

'না, তুমি আমাকে, মানে আমাদের রক্ষা করেছো।'

'আমার নিজেকে ভয়ংকর কোনো প্রাণী মনে হচ্ছে!'

'উহু, তুমি আসলে একটা অসচরাচর কেস!'

'তারমানে কী?'

'এখন ঘুমাও, ওই আলোচনার জন্য তুমি এই মুহূর্তে রেডি না!'

আন্না আপত্তি করলো না। ও আসলেই ক্লান্ত।

ঘুমিয়ে পড়লো।



মাসুদুল হকের জন্ম ঢাকায়, সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক, এক দশকের বেশি সময় ধরে লিখছেন গল্প ও উপন্যাস।
বিষয়বস্তু: রহস্য উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও শিশুকিশোর সাহিত্য।

সাহিত্য পুরস্কার: কালি ও কলম তরুণ কথাসাহিত্যিক পুরস্কার ২০১৩

ওয়েবসাইট: www.masudulhaque.com

লেখকের ছবি: তারেক আহমেদ

অসচরাচর নাজুক মানসিক অবস্থার একজন তরুণ [illegible]
পড়ছ. রোগী দেখতে গিয়ে তিনি কিছু বিচিত্র বিপজ্জনক [illegible]
অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান. যেসবের হয়তো [illegible]
ব্যাখ্যা নেই বা সেসব ব্যাখ্যার জন্য আমরা প্রস্তুত নই।